হিন্দুধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা

ষষ্ঠ শ্রেণি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০১৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে
ষষ্ঠ শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

হিন্দুধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা

ষষ্ঠ শ্রেণি

রচনা

প্রফেসর ড. পরেশ চন্দ্র মণ্ডল
প্রফেসর ড. দুলাল কান্তি ভৌমিক
বিষ্ণু দাশ
ড. ধীরেন্দ্রনাথ তরফদার
ড. শিশির মল্লিক
শিখা দাস

সম্পাদনা

প্রফেসর নিরঞ্জন অধিকারী

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা ১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত।

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

পরীক্ষামূলক সংস্করণ

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ২০১২

পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে সমন্বয়ক

প্রীতিশকুমার সরকার

গৌরাঙ্গ লাল সরকার

কম্পিউটার কম্পোজ

বর্ণনস কালার স্ক্যান

প্রচ্ছদ

সুদর্শন বাছার

সুজাউল আবেদীন

চিত্রাঙ্কন

উজ্জ্বল ঘোষ

ডিজাইন

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে :

প্রসঙ্গ–কথা

শিক্ষা জাতীয় জীবনের সর্বোতমুখী উন্নয়নের পূর্বশর্ত। আর দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে বাংলাদেশকে উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজন সুশিক্ষিত জনশক্তি। ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশ গড়ার জন্য শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত মেধা ও সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশে সাহায্য করা মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য। এছাড়া প্রাথমিক স্তরে অর্জিত শিক্ষার মৌলিক জ্ঞান ও দক্ষতা সম্প্রসারিত ও সুসংহত করার মাধ্যমে উচ্চতর শিক্ষার যোগ্য করে তোলাও এ স্তরের শিক্ষার উদ্দেশ্য। জ্ঞানার্জনের এই প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে শিক্ষার্থীকে দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পরিবেশগত পটভূমির প্রেক্ষিতে দক্ষ ও যোগ্য নাগরিক করে তোলাও মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম বিবেচ্য বিষয়।

জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে পরিমার্জিত হয়েছে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রম। পরিমার্জিত এই শিক্ষাক্রমে জাতীয় আদর্শ, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও সমকালীন চাহিদার প্রতিফলন ঘটানো হয়েছে, সেই সাথে শিক্ষার্থীদের বয়স, মেধা ও গ্রহণ ক্ষমতা অনুযায়ী শিখনফল নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়া শিক্ষার্থীর নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ থেকে শুরু করে ইতিহাস ও ঐতিহ্য চেতনা, মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিবোধ, দেশপ্রেমবোধ, প্রকৃতি-চেতনা এবং ধর্ম-বর্ণ-গোত্র ও নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবার প্রতি সমমর্যাদাবোধ জাগ্রত করার চেষ্টা করা হয়েছে। একটি বিজ্ঞানমনস্ক জাতি গঠনের জন্য জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের স্বতঃস্ফূর্ত প্রয়োগ ও ডিজিটাল বাংলাদেশের রূপকল্প-২০২১ এর লক্ষ্য বাস্তবায়নে শিক্ষার্থীদের সক্ষম করে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে।

নতুন এই শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রণীত হয়েছে মাধ্যমিক স্তরের প্রায় সকল পাঠ্যপুস্তক। উক্ত পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে শিক্ষার্থীদের সামর্থ্য, প্রবণতা ও পূর্ব অভিজ্ঞতাকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকগুলোর বিষয় নির্বাচন ও উপস্থাপনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশ সাধনের দিকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি অধ্যায়ের শুরুতে শিখনফল যুক্ত করে শিক্ষার্থীর অর্জিতব্য জ্ঞানের ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে এবং বিচিত্র কাজ, সৃজনশীল প্রশ্ন ও অন্যান্য প্রশ্ন সংযোজন করে মূল্যায়নকে সৃজনশীল করা হয়েছে।

জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ এর আলোকে মাধ্যমিক স্তরের ষষ্ঠ হতে অষ্টম শ্রেণির হিন্দুধর্ম শিক্ষা পাঠ্যপুস্তকটির নামকরণ করা হয়েছে **হিন্দুধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা**। এ পাঠ্যপুস্তকের প্রতিটি অধ্যায়ে ধর্মের তাত্ত্বিক বিষয়সমূহ সরলভাবে উপস্থাপনের পাশাপাশি ধর্মীয় ধারণার জীবনাচরণমুখী শিক্ষা এবং এর প্রায়োগিক দিক আলোচিলত হয়েছে। ফলে এ পাঠ্যপুস্তকটি অধ্যয়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা উপলব্ধি করতে পারবে, ধর্মের তাত্ত্বিক জ্ঞান শুধুমাত্র ধর্মালাপ এবং অনুষ্ঠান আলোচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় এটি নৈতিক চরিত্র গঠন এবং সমাজের একজন নৈতিক ও মানবিক গুণসম্পন্ন ভালোমানুষ গড়ে তোলার পথ নির্দেশকও।

একবিংশ শতকের অঙ্গীকার ও প্রত্যয়কে সামনে রেখে পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আলোকে পাঠ্যপুস্তকটি রচিত হয়েছে। কাজেই পাঠ্যপুস্তকটির আরও সমৃদ্ধিসাধনের জন্য যে কোনো গঠনমূলক ও যুক্তিসঙ্গত পরামর্শ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত হবে। পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের বিপুল কর্মযজ্ঞের মধ্যে অতি স্বল্প সময়ের মধ্যে পুস্তকটি রচিত হয়েছে। ফলে কিছু ভুলত্রুটি থেকে যেতে পারে। পরবর্তী সংস্করণগুলোতে পাঠ্যপুস্তকটিকে আরও সুন্দর, শোভন ও ত্রুটিমুক্ত করার চেষ্টা অব্যাহত থাকবে। বানানের ক্ষেত্রে অনুসৃত হয়েছে বাংলা একাডেমী কর্তৃক প্রণীত বানানরীতি।

পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, চিত্রাঙ্কন, নমুনা প্রশ্নাদি প্রণয়ন ও প্রকাশনার কাজে যারা আন্তরিকভাবে মেধা ও শ্রম দিয়েছেন তাঁদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। পাঠ্যপুস্তকটি শিক্ষার্থীদের আনন্দিত পাঠ ও প্রত্যাশিত দক্ষতা অর্জন নিশ্চিত করবে বলে আশা করি।

প্রফেসর মোঃ মোস্তফা কামালউদ্দিন
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা।

সূচিপত্র

অধ্যায়	অধ্যায়ের শিরোনাম	পৃষ্ঠা
প্রথম	স্রষ্টা ও সৃষ্টি	১-৮
দ্বিতীয়	ধর্মগ্রন্থ	৯-২০
তৃতীয়	হিন্দুধর্মের স্বরূপ ও ধর্মবিশ্বাস	২১-৩১
চতুর্থ	নিত্যকর্ম ও যোগাসন	৩২-৪০
পঞ্চম	দেব-দেবী ও পূজা-পার্বণ	৪১-৪৯
ষষ্ঠ	ধর্মীয় উপাখ্যানে নৈতিক শিক্ষা	৫০-৬১
সপ্তম	আদর্শ জীবনচরিত	৬২-৭৭
অষ্টম	হিন্দুধর্ম ও নৈতিক মূল্যবোধ	৭৮-৮৮

প্রথম অধ্যায়

স্রষ্টা ও সৃষ্টি

কোনোকিছু সৃষ্টির জন্য একজন স্রষ্টার প্রয়োজন হয়। স্রষ্টা ছাড়া কোনোকিছুর সৃষ্টি হয় না। এ মহাবিশ্ব ও মহাবিশ্বের সবকিছু অর্থাৎ মানুষ, গাছপালা, জীবজন্তু, চন্দ্র, সূর্য. গ্রহ, তারা, আকাশ-বাতাস প্রভৃতি এক-একটি সৃষ্টি। এসকল সৃষ্টির একজন স্রষ্টা রয়েছেন। আমরা তাঁকে দেখতে পাই না, কিন্তু তাঁর অস্তিত্ব অনুভব করি। আমরা তাঁকে ঈশ্বর নামে ডাকি। তাঁর অনেক নাম— ব্রহ্ম, পরমেশ্বর, পরমাত্মা, ভগবান, আত্মা ইত্যাদি। ঈশ্বর প্রতিটি জীবের মধ্যে আত্মারূপে বিরাজ করেন। তাই আমরা জীবের সেবা করব। তা হলেই ঈশ্বরের সেবা করা হবে। হিন্দুধর্ম আমাদের এ শিক্ষা দেয়। হিন্দুধর্মবিষয়ক গ্রন্থগুলো সংস্কৃত ভাষায় রচিত। এসকল ধর্মগ্রন্থে ঈশ্বর সম্পর্কে অনেক মন্ত্র বা শ্লোক এবং কবিতা রয়েছে। এ অধ্যায়ে আমরা স্রষ্টা ও সৃষ্টির ধারণা, সকল জীবে স্রষ্টার বা ঈশ্বরের অস্তিত্ব, স্রষ্টা ও সৃষ্টির সম্পর্ক বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করব। সবশেষে ঈশ্বর-সম্পর্কিত একটি সংস্কৃত মন্ত্র বা শ্লোক বাংলা অর্থসহ ব্যাখ্যা করব।

এ অধ্যায় শেষে আমরা—

- স্রষ্টা ও সৃষ্টি সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারব
- সকল জীবের মধ্যে স্রষ্টা বা ঈশ্বরের অস্তিত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব
- ধর্মগ্রন্থ থেকে ঈশ্বরসম্পর্কিত একটি সহজ সংস্কৃত মন্ত্র বা শ্লোক সরলার্থসহ বলতে পারব এবং ব্যাখ্যা করতে পারব
- সৃষ্টির মধ্যে স্রষ্টার অস্তিত্ব উপলব্ধি করে জীবসেবায় উদ্বুদ্ধ হব।

পাঠ ১ : স্রষ্টা ও সৃষ্টির ধারণা

পৃথিবী বড় সুন্দর ও বিচিত্র। এখানে রয়েছে মানুষ, পশু-পাখি, কীটপতঙ্গ, গাছপালা, নদনদী, পাহাড়-পর্বত, মরু-প্রান্তরসহ আরও কতরকমের বৈচিত্র্য। পৃথিবীর উপরে রয়েছে সুনীল আকাশ। আকাশে বিরাজ করছে চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র, ধূমকেতু, ছায়াপথ ইত্যাদি।

এই পৃথিবীর সকল জীবের মধ্যে মানুষ শ্রেষ্ঠ জীব। সে নিজের প্রয়োজনে অনেক কিছু সৃষ্টি করতে পারে, যা অনেক জীবই পারে না। সহজেই একজন কাঠমিস্ত্রি কাঠ দিয়ে চেয়ার, টেবিল, নৌকা প্রভৃতি প্রস্তুত করতে পারেন। কিন্তু অন্য প্রাণীরা তা করতে পারে না। এই চেয়ার, টেবিল নৌকা ইত্যাদি সৃষ্টির জন্য কাঠের প্রয়োজন।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে– কাঠ কীভাবে সৃষ্টি হয়েছে? উত্তরটা খুবই সহজ। গাছ কেটে কাঠ প্রস্তুত হয়েছে এবং কাঠ থেকে তক্তা তৈরি করে নৌকা বানানো হয়েছে। এর পরের প্রশ্ন– গাছ কীভাবে সৃষ্টি হয়েছে, কে সৃষ্টি করেছেন? এ- প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করা যাক।

আমরা আগেই বলেছি, সকল সৃষ্টির মূলে একজন স্রষ্টা রয়েছেন। তাহলে গাছেরও একজন স্রষ্টা আছেন। এই যে পাহাড়-পর্বত, নদী-সমুদ–এসবেরও একজন স্রষ্টা আছেন। সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, তারা, ধূমকেতু, ছায়াপথ– সব তাঁরই সৃষ্টি। তিনিই মানুষ সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন পশু-পাখি-কীট-পতঙ্গ এবং গাছপালা। সারকথা হলো এ- মহাবিশ্ব ও জীবকুলের একজনই স্রষ্টা। স্রষ্টা সবকিছু সৃষ্টি করেন। আর মানুষ স্রষ্টার কোনো সৃষ্টি অবলম্বন করে সৃষ্টি করে। যেমন, স্রষ্টা গাছ সৃষ্টি করেছেন। মানুষ তা থেকে চেয়ার, টেবিল, নৌকা ইত্যাদি তৈরি করতে পেরেছে। তাই মানুষের সৃষ্টি স্রষ্টার সৃষ্টির ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু স্রষ্টার সৃষ্টি তাঁর নিজের ইচ্ছাধীন।

হিন্দুধর্ম অনুসারে এই স্রষ্টা বা সৃষ্টিকর্তাকে ঈশ্বর নামে অভিহিত করা হয়। ঈশ্বরের অনেক নাম, অনেক পরিচয়। যেমন– ব্রহ্ম, ভগবান, পরমাত্মা ইত্যাদি। আবার পরমাত্মা যখন জীবের মধ্যে আত্মারূপে অবস্থান করেন, তখন তাঁকে আত্মা বা জীবাত্মা বলা হয়। জীবাত্মা পরমাত্মারই অংশ। তাহলে দেখা যাচ্ছে, মানুষ, মহাবিশ্ব এবং মহাবিশ্বের সবকিছুই হচ্ছে সৃষ্টি। এসকল সৃষ্টির যিনি স্রষ্টা বা সৃষ্টিকর্তা তাঁর নাম ঈশ্বর।

ঈশ্বরকে কেউ দেখতে পায় না, তাঁর কোনো আকার নেই। তিনি নিরাকার। কিন্তু তাঁর সৃষ্টির আকার আছে। তাঁর সৃষ্টির মধ্যে আমরা তাঁকে অনুভব করি। তাঁকে তাঁর সৃষ্টির যে-কোনো আকৃতিতে উপলব্ধি করা যায়। সাধকেরা সাধনার মাধ্যমে এবং ভক্তেরা ভক্তির মাধ্যমে তাঁর সান্নিধ্য উপলব্ধি করে থাকেন।

নতুন শব্দ : ব্রহ্ম, জীবাত্মা, পরমাত্মা, পরমেশ্বর, নিরাকার, সান্নিধ্য, উপলব্ধি।

একক কাজ : * ঈশ্বরের তিনটি নাম লেখ।
* স্রষ্টার সৃষ্টি হিসেবে তোমার বাসস্থানের চারপাশের বিশটি সৃষ্টির তালিকা প্রস্তুত কর।

পাঠ ২ : সকল জীবে স্রষ্টার অস্তিত্ব

ঈশ্বর এ মহাবিশ্বের সবকিছু– চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র, আকাশ, বাতাস এবং সকল জীব সৃষ্টি করেছেন। আবার ঈশ্বর নিজের সৃষ্ট জীবের মধ্যে নিজেই আত্মারূপে বিরাজ করছেন। তাই জীবদেহ সচল।

ঈশ্বর ছাড়া জীবদেহের অস্তিত্ব চিন্তা করা যায় না। আত্মাই জীবদেহের প্রাণ। জীবদেহে আত্মার অস্তিত্ব যতদিন বিদ্যমান থাকে, ততদিনই জীবদেহ সচল থাকে। আত্মা জীবদেহ থেকে সরে গেলে আমরা এ অবস্থাকে জীবদেহের মৃত্যু বলে অভিহিত করি। এ অবস্থায় জীবদেহের মধ্যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব থাকে না। আত্মা নিরাকার। তাই আমরা আত্মাকে দেখতে পাই না কিন্তু তার উপস্থিতি উপলব্ধি করতে পারি। হিন্দুধর্ম বিশ্বাস করে, আত্মার মৃত্যু হয় না, অবস্থান ত্যাগ করে অন্য অবস্থানে আশ্রয় নেয়। অর্থাৎ আত্মার মৃত্যু নেই ।

আত্মাই ঈশ্বর। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় বলা হয়েছে, মানুষ যেমন পুরাতন কাপড় পরিত্যাগ করে নতুন কাপড় পরিধান করে, আত্মাও তেমনি পুরাতন দেহ পরিত্যাগ করে নতুন দেহ ধারণ করে। আত্মার এ পরিবর্তনের মধ্যে লুকিয়ে আছে জীবের জন্ম ও মৃত্যু। আত্মা নিরাকার কিন্তু প্রতিটি জীবদেহে তাঁর উপস্থিতি আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় সৃষ্টির উপর তাঁর কর্তৃত্বের কথা, সৃষ্টির মধ্যে তাঁর অস্তিত্বের কথা। জীবের অস্তিত্ব স্রষ্টা বা ঈশ্বরের উপর নির্ভরশীল।

একক কাজ : * স্রষ্টার কয়েকটি সৃষ্টির নাম লেখ।
* স্রষ্টার অস্তিত্বের কয়েকটি দৃষ্টান্ত চিহ্নিত কর।

নতুন শব্দ : অস্তিত্ব, সচল, জীবদেহ, শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা।

পাঠ ৩ : স্রষ্টা ও সৃষ্টির সম্পর্ক

স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান। স্রষ্টার ইচ্ছাতেই সৃষ্টি হয়। আমরা জানি, ঈশ্বর তাঁর সৃষ্টির মধ্যে অবস্থান করেন। তাই ঈশ্বর তাঁর নিজের সৃষ্টির মধ্যে আনন্দ খুঁজে পান।

এক ঈশ্বর বহুরূপে জীবের মধ্যে অবস্থান করেন। সুতরাং জীবের সেবা করলেই ঈশ্বরের সেবা করা হয়। এ প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন—

'বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর,
জীবে প্রেম করে যেইজন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।'

অর্থাৎ জীবের মধ্যে এক ঈশ্বর বহুরূপে বিরাজ করেন। তাই ঈশ্বরকে বাইরে খোঁজার প্রয়োজন হয় না এবং জীবকে সেবা করলেই ঈশ্বরকে সেবা করা হয়।

ঈশ্বর মানুষ ও জীবজন্তুর কল্যাণের জন্য এ সুন্দর প্রকৃতি সৃষ্টি করেছেন। এ প্রকৃতিতে বিরাজ করছে কতরকমের ফুল, কতরকমের ফল এবং বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য। আমরা খাদ্যের জন্য এই প্রকৃতির উপর নির্ভর করি। কাজেই স্রষ্টার সৃষ্টি হিসেবে ঈশ্বরসৃষ্ট পরিবেশকে রক্ষার জন্য পরিবেশে বসবাসকারী পশু-পাখি, বৃক্ষ-লতা ও সকল জীবের পরিচর্যা ও রক্ষা করা আমাদের কর্তব্য।

ঈশ্বর যে সৃষ্টি করেন তা তাঁর নিজের প্রয়োজনে নয়। তিনি নিজের আনন্দের জন্য সৃষ্টি করেন। একেই বলে তাঁর লীলা।

তিনি এ মহাবিশ্বের আকাশ, বাতাস, পাহাড়-পর্বত, সমুদ্র-নদী, বনভূমি, গাছপালা ও বিচিত্র সব জীবজন্তু সৃষ্টি করে তাঁর লীলার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। আমরা সহজেই তা অনুভব করতে পারি। স্রষ্টা অনাদি ও অনন্ত। কিন্তু সৃষ্টির আদি ও অন্ত আছে। অর্থাৎ সৃষ্টির উদ্ভব ও ধ্বংস, জন্ম ও মৃত্যু আছে।

নতুন শব্দ : বিদ্যমান, সেবিছে, পরিচর্যা, লীলা।

দলীয় কাজ : স্রষ্টা ও সৃষ্টির সম্পর্ক উল্লেখ কর

স্রষ্টা	সৃষ্টি
সৃষ্টি করেন	স্রষ্টার দ্বারা সৃষ্ট হয়
পালন করেন	
নিয়ন্ত্রণ করেন	
অনাদি ও অনন্ত	

একক কাজ : * স্রষ্টা তার সৃষ্টিকে কীভাবে ভালোবাসেন তার দুটি উদাহরণ উল্লেখ কর।
* সৃষ্টির মধ্যেই স্রষ্টার অবস্থান একথা অনুযায়ী আমাদের কী করা উচিত সে সম্পর্কে পাঁচটি বাক্য লেখ।

পাঠ ৪ : ঈশ্বরসম্পর্কিত সংস্কৃত মন্ত্র ও সরলার্থ

ঈশ্বর পরম ব্রহ্ম। তাঁর অসীম ক্ষমতা। তিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন, পালন করছেন। আমরা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ। তাই কৃতজ্ঞতাবশত এবং আমাদের মঙ্গলের জন্য আমরা ঈশ্বরের প্রশংসা করি। একেই বলে স্তব বা স্তুতি।

এসো, আমরা ঈশ্বরের মাহাত্ম্যপ্রকাশক একটি মন্ত্র পরম শ্রদ্ধাভরে উচ্চারণ করি :

নমস্তে পরমং ব্রহ্ম

সর্বশক্তিমতে নমঃ॥

নিরাকারোঽপি সাকারঃ

স্বেচ্ছারূপং নমো নমঃ। (যজুর্বেদ,শান্তিপাঠ)

সরলার্থ : যিনি পরম ব্রহ্ম, যিনি সর্বশক্তিমান, নিরাকার হয়েও সাকার, ইচ্ছামতো রূপধারী, তাঁকে নমস্কার করি।

এ মন্ত্র থেকে বোঝা যায়, ঈশ্বরের অপর নাম ব্রহ্ম। তাঁকে পরমব্রহ্মও বলা হয়। তিনি নিরাকার। তবে প্রয়োজনে সাকার রূপও ধারণ করে থাকেন। যেমন নিরাকার ঈশ্বর সাকার শ্রীকৃষ্ণরূপে পৃথিবীতে এসেছেন। তিনি তাঁর ইচ্ছেমতো রূপ ধারণ করতে পারেন। তিনি যুগে যুগে বিভিন্ন অবতার রূপ ধারণ করেছেন। যেমন– বামন অবতার, নৃসিংহ অবতার, রাম অবতার ইত্যাদি। তিনি দুষ্টের দমন করে শিষ্টের পালন করেন। এই অনন্ত শক্তিময় ঈশ্বরকে আমরা নমস্কার করি, বার বার নমস্কার করি।

একক কাজ : ঈশ্বরসম্পর্কিত মন্ত্রের শিক্ষা এবং আমাদের করণীয় সম্পর্কে লেখ।

শব্দ বিশ্লেষণ :

নমস্তে — নমঃ + তে । পরমং ব্রহ্ম — পরম ব্রহ্মকে । সর্বশক্তিমতে — সর্বশক্তিমানকে । নিরাকারঃ — নিঃ + আকারঃ। নিরাকারোঽপি — নিরাকারঃ + অপি (যার আকার নেই। যাকে দেখা যায় না, তবে অনুভব করা যায়। এখানে নিরাকার ব্রহ্ম বা ঈশ্বরকে বোঝানো হয়েছে)। সাকারঃ — স + আকারঃ (যার আকার আছে ; প্রয়োজনে ঈশ্বর সাকারও হতে পারেন)।

স্বেচ্ছা — স্ব + ইচ্ছা। স্বেচ্ছারূপং — স্বেচ্ছারূপধারীকে অর্থাৎ স্বয়ং ঈশ্বরকে।

টীকা : বেদ, উপনিষদ প্রভৃতি বৈদিক ধর্মগ্রন্থের কবিতাগুলোকে বলা হয় মন্ত্র এবং বৈদিক যুগের পরবর্তীকালে সংস্কৃত ভাষায় রচিত ধর্মগ্রন্থের কবিতাগুলোকে বলা হয় শ্লোক।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ কর :

১. হিন্দুধর্ম মতে প্রতিটি জীবের মধ্যে আত্মারূপে ..... বিরাজ করেন।

২. ভক্তরা ..... মাধ্যমে ঈশ্বরের সান্নিধ্য উপলব্ধি করে।

৩. আত্মাই..... ।

৪. আত্মার ..... নেই।

৫. ঈশ্বরের প্রশংসামূলক মন্ত্রকে ..... বলা হয়।

ডানপাশ থেকে শব্দ বা বাক্যাংশ এনে বাম পাশের সাথে মিল কর :

বামপাশ	ডানপাশ
১. যারা সৎপথে চলে	অজ, নিত্য, শাশ্বত
২. পরমাত্মা	জীবের জন্ম ও মৃত্যু
৩. হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা	ঈশ্বর তাদেরকে ভালোবাসেন
৪. আত্মার পরিবর্তনের মধ্যে লুকিয়ে আছে	রূপধারণ করতে পারেন।
৫. ঈশ্বর নিজের ইচ্ছামতো	বিভিন্ন প্রকৃতিতে ঈশ্বরের পূজা করে।
	পরমেশ্বর

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

১. ঈশ্বরের অপর নাম কী?

ক. ব্রহ্ম খ. বিষ্ণু

গ. শিব ঘ. ব্রহ্মা

২. ঈশ্বর অবস্থান করেন –

i. আকাশে

ii. জীবদেহে

iii. বাতাসে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. i ও ii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

প্রবীর এঁটেল মাটি নিয়ে খেলা করছিল। এক পর্যায়ে দেখা গেল একটি পুতুল তৈরি হয়ে গেছে, কিন্তু প্রকৃতির সৃষ্টি প্রবীরের সৃষ্টির মতো নয়।

৩. অনুচ্ছেদে প্রবীরের মধ্যে 'স্রষ্টা ও সৃষ্টি' অধ্যায়ের যে- দিকটি ফুটে উঠেছে তা হলো–

i. সৃষ্টি

ii. লীলা

iii. সৌন্দর্য

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৪. প্রকৃতির সৃষ্টি প্রবীরের পুতুল সৃষ্টির মতো নয়, কারণ–

i. প্রবীরের সৃষ্টি উদ্দেশ্যগত নয় কিন্তু প্রকৃতির সৃষ্টি উদ্দেশ্যগত

ii. প্রবীরের সৃষ্টি নির্দিষ্ট উপাদান দ্বারা কিন্তু প্রকৃতির সৃষ্টি নির্দিষ্ট উপাদান দ্বারা নয়

iii. প্রবীরের সৃষ্টির মধ্যে বৈচিত্র্য নেই কিন্তু প্রকৃতির সৃষ্টির মধ্যে বৈচিত্র্য আছে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১. সাকার কথাটি উদাহরণসহ বুঝিয়ে লেখ।

২. আমরা ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করব কেন? বুঝিয়ে লেখ।

৩. স্রষ্টা ও সৃষ্টির সম্পর্ক উদাহরণসহ তুলে ধর।

বর্ণনামূলক প্রশ্ন :

১. ঈশ্বরই পৃথিবীর সবকিছুর স্রষ্টা– যুক্তি সহকারে ব্যাখ্যা কর।

২. জীবাত্মাকে পরমাত্মার অংশ বলা হয় কেন? বুঝিয়ে লেখ।

৩. 'জীবসেবাই ঈশ্বরসেবা'– উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর।

সৃজনশীল প্রশ্ন :

'আছ অনল অনিলে চির নভোনীলে
ভূধর সলিল গহনে
আছ বিটপী লতায় জলদের গায়
শশী তারকায় তপনে।'

উপরে বর্ণিত কবিতাংশে সৃষ্টিকর্তার প্রতি বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে সজীব তার জীবন পরিচালনা করে। অন্যদিকে তার ভাই তুষার সারাক্ষণ বিজ্ঞান নিয়ে চিন্তাভাবনা করে। সুযোগ পেলেই কম্পিউটারের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে গবেষণায় ব্যস্ত হয়ে পড়ে। তার ধারণা বিজ্ঞানই সবকিছু। সজীব ও তুষার দুই ভাই হওয়া সত্ত্বেও দুজনার সৃষ্টিকর্তার প্রতি বিশ্বাসে পার্থক্য লক্ষ করা যায়।

ক. হিন্দুধর্ম অনুসারে সৃষ্টিকর্তাকে কীনামে অভিহিত করা যায়? ১

খ. জীবাত্মাকে পরমাত্মার অংশ বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. 'স্রষ্টা ও সৃষ্টি' অধ্যায়ের সারকথার সাথে তুষারের জীবন পরিচালনার মূল পার্থক্য ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. সজীবের সৃষ্টিকর্তার প্রতি বিশ্বাস 'স্রষ্টা ও সৃষ্টি' অধ্যায়ের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

দ্বিতীয় অধ্যায়

ধর্মগ্রন্থ

যে- গ্রন্থে ধর্ম ও কল্যাণকর জীবনযাপন সম্পর্কে আলোচনা, উপদেশ ও উপাখ্যান লেখা থাকে, তাকে ধর্মগ্রন্থ বলে। বেদ, উপনিষদ, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত, শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা, শ্রীচণ্ডী প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থ। আমরা জানি, বেদ হিন্দুদের আদি ধর্মগ্রন্থ। এ অধ্যায়ে বেদ ও শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হবে।

এ অধ্যায় শেষে আমরা —

- ধর্মগ্রন্থের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব
- ধর্মগ্রন্থ হিসেবে বেদ ও শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার সাধারণ পরিচয় ব্যাখ্যা করতে পারব
- জীবনাচরণে বেদের শিক্ষা বর্ণনা করতে পারব
- শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণের কয়েকটি বাণী ব্যাখ্যা করতে পারব
- বেদ ও শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব
- বেদ ও শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারব।

পাঠ ১ : ধর্মগ্রন্থের ধারণা ও বেদের পরিচয়

আমরা জানি, যে- গ্রন্থে ধর্মের কথা থাকে, তাকে ধর্মগ্রন্থ বলা হয়। ধর্মগ্রন্থে থাকে ঈশ্বরের বাণী ও মাহাত্ম্যের বর্ণনা। থাকে সৎ ও পরিশুদ্ধ জীবনযাপনের বিধিবিধান। আমাদের মঙ্গল হয় এমন উপদেশও থাকে। এসকল উপদেশ যে কেবল সরাসরি দেওয়া হয় তা নয়। উপাখ্যানের মধ্য দিয়েও বিভিন্ন উপদেশ দেওয়া হয়। এসকল উপদেশের মাধ্যমে আমরা পাই নৈতিক শিক্ষা। এ নৈতিক শিক্ষা আমাদের ভালো মানুষ হিসেবে গড়ে তোলে। আমাদের অনেক ধর্মগ্রন্থ আছে। যেমন বেদ, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত, শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ইত্যাদি।

বেদ হিন্দুদের আদি এবং প্রধান ধর্মগ্রন্থ। 'বেদ' শব্দের অর্থ জ্ঞান। এ- জ্ঞান পবিত্র। এ- জ্ঞান বিচিত্র সুন্দর প্রকৃতি এবং এর স্রষ্টা সম্পর্কে জ্ঞান। এ- জ্ঞান চারপাশের মানুষ ও জীবন সম্পর্কে জ্ঞান। জ্ঞানের কি শেষ আছে? জ্ঞান কি এমনি এমনি পাওয়া যায়? তার জন্য চেষ্টা করতে হয়, সাধনা করতে হয়। গভীর চিন্তায় ডুবে যাওয়া বা নিমগ্ন হওয়াকে বলে ধ্যান। ধ্যানে সত্যকে উপলব্ধি করা যায়। সত্য চিরন্তন ও সনাতন। যা সনাতন তার অন্ত নেই। এ- সত্য সৃষ্টি করা যায় না, এ- সত্য গভীর ধ্যানের আলোতে দর্শন করা যায়— উপলব্ধি করা যায়।

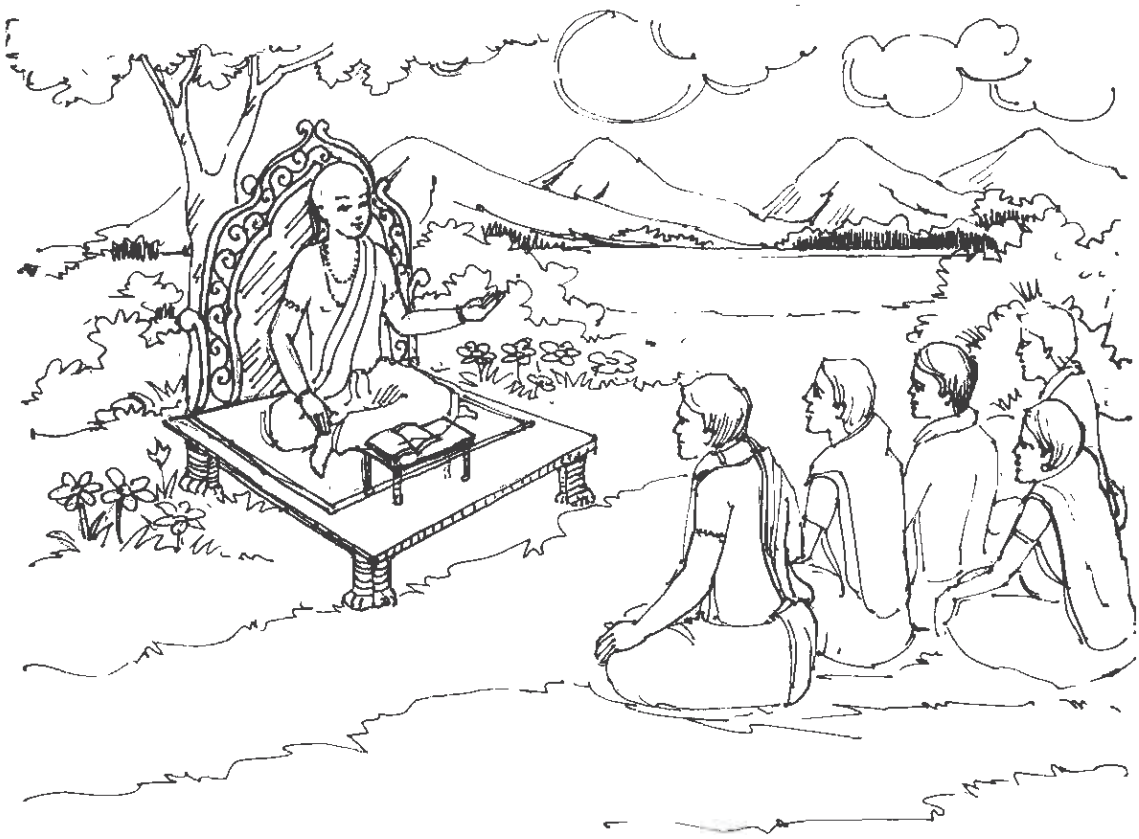

প্রাচীনকালে যাঁরা সত্য বা জ্ঞান এবং স্রষ্টার মাহাত্ম্য দর্শন বা উপলব্ধি করতে পারতেন, তাঁদের বলা হতো ঋষি। বেদ এই ঋষিদের ধ্যানলব্ধ পবিত্র জ্ঞান। ধ্যানের মাধ্যমে ঋষিগণ সেই সত্য দর্শন করে তাকে ভাবের আবেগে প্রকাশ করেছেন। এজন্যই বলা হয়, বেদ সৃষ্ট নয়, দৃষ্ট। অর্থাৎ বেদ কেউ সৃষ্টি করেননি, উপলব্ধি করেছেন মাত্র।

একক কাজ : ধর্মগ্রন্থ ও সাধারণ গ্রন্থের মধ্যে পার্থক্য চিহ্নিত কর।

নতুন শব্দ : নিমগ্ন , উপলব্ধি, সনাতন, ধ্যানলব্ধ, দৃষ্ট।

পাঠ ২ : বেদের বিষয়

বেদে বহু দেব-দেবীর বর্ণনা পাওয়া যায়। যেমন – অগ্নি, সূর্য, ইন্দ্র, বিষ্ণু, বায়ু, বরুণ, রুদ্র, যম, ঊষা, বাক্, রাত্রি, সরস্বতী ইত্যাদি। তবে বেদে বলা হয়েছে, একই পরমাত্মা থেকে সকল দেব-দেবীর উদ্ভব। প্রত্যেকের গুণ ও শক্তি-ভেদে তাঁরা ভিন্ন ভিন্ন দেব-দেবী রূপে প্রকাশিত।

ঋষিগণ এই দেব-দেবীর মাহাত্ম্য তুলে ধরেছেন। তাঁদের স্তুতি বা প্রশংসা করেছেন এবং অসাধারণ শক্তি ও প্রভাবসম্পন্ন দেব-দেবীর কাছে ধনসম্পদ, সুখ ও শান্তি প্রার্থনা করেছেন। ঋষিগণ বেদের দেবতাদের তিন ভাগে ভাগ করেছেন—

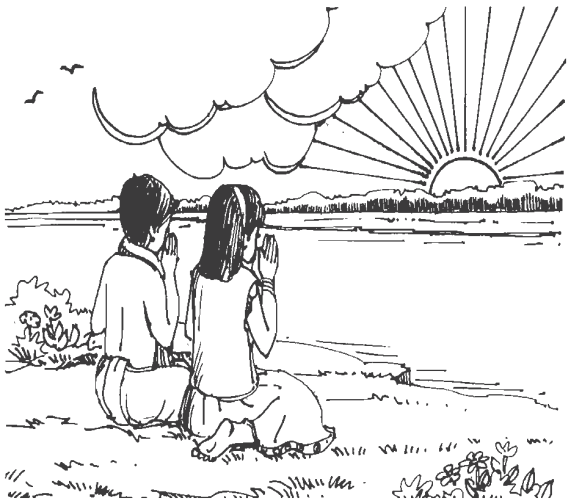

১. স্বর্গের দেবতা : এঁদের ক্ষমতাই শুধু বোঝা যায়। এঁরা পৃথিবীতে নেমে আসেন না। যেমন— সূর্য, যম, বরুণ প্রভৃতি।

২. অন্তরিক্ষের দেবতা : এঁদের ক্ষমতা বোঝা যায়। দেখাও যায়। এঁরা মর্তে নেমে আসেন কিন্তু অবস্থান করেন না। যেমন— ইন্দ্র, বায়ু ইত্যাদি। ইন্দ্র— বৃষ্টি ও শিশিরের দেবতা।

৩. মর্তের দেবতা : যেসকল দেবতা মর্তে বা পৃথিবীতে আসেন এবং অবস্থান করেন তাঁদের বলা হয় মর্তের দেবতা। যেমন– অগ্নিদেবতা।

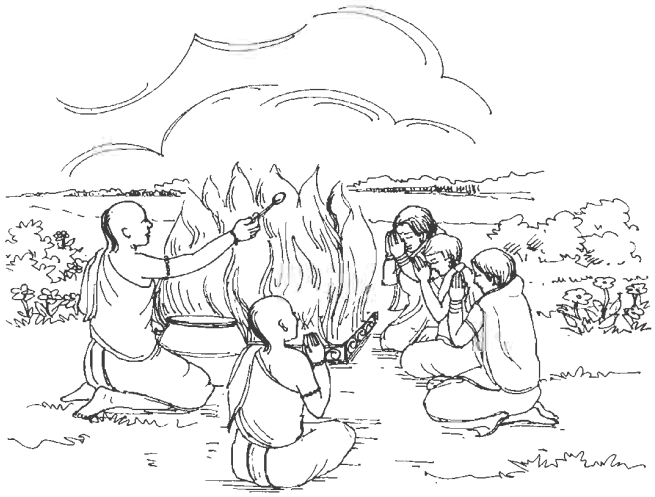

অগ্নিকে আমরা পৃথিবীতে দেখতে পাই। তাই তাঁর কাছে ভালো ভালো জিনিস উৎসর্গ করে তাঁরই মাধ্যমে অন্যান্য দেবতার নিকট প্রার্থনা জানানো হয়। এই যে আগুন জ্বেলে বেদের মন্ত্র উচ্চারণ করে দেবতাদের আহ্বান জানানো এবং প্রার্থনা করা, একেই বলে যজ্ঞ।

বেদের ছন্দোবদ্ধ বাক্যকে বলা হয় মন্ত্র। ঋষিরা বেদ থেকে মন্ত্র উচ্চারণ করে ধর্মানুষ্ঠান বা উপাসনা করেছেন। বৈদিক উপাসনা পদ্ধতি ছিল যজ্ঞ বা হোম করা। এ ছাড়া বেদের বাক্য সুর দিয়ে যজ্ঞের সময় গান করা হয়েছে। বেদে রয়েছে এইরকম কিছু গান। এই গানকে সেকালে বলা হতো সাম। জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রের বিচিত্র জ্ঞানের কথাও বেদে রয়েছে।

দলীয় কাজ : স্বর্গ, মর্ত ও অন্তরিক্ষের দেব-দেবীর একটি তালিকা তৈরি কর।

নতুন শব্দ : মাহাত্ম্য, অন্তরিক্ষ, মর্ত।

পাঠ ৩ : বেদের শ্রেণিবিভাগ

বিষয়বস্তু ও রচনারীতির পার্থক্য সামনে রেখে বেদের শ্রেণিবিভাগ বিভক্ত করেছেন মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন। বেদকে তিনি বিভক্ত করেছেন বলে তাঁকে বলা হয়েছে বেদব্যাস। তাঁর শিষ্যরা তাঁকে একাজে সাহায্য করেছেন। বেদকে চার ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। যথা– ঋগ্বেদ, সামবেদ, যজুর্বেদ ও অথর্ববেদ।

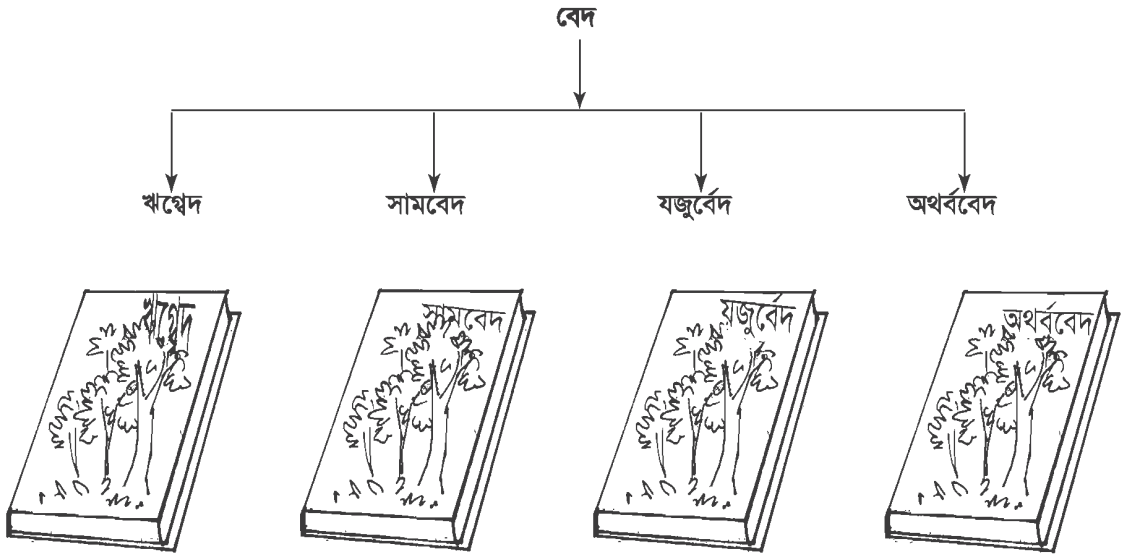

১. **ঋগ্বেদ –** ঋক্ মানে মন্ত্র। ঋগ্বেদে রয়েছে স্তুতি ও প্রার্থনামূলক মন্ত্র। স্তুতি মানে প্রশংসা আর প্রার্থনা মানে কোনো-কিছু চাওয়া। প্রার্থনা করে এক এক দেবতার কাছ থেকে এক এক বিষয় চাওয়া হয়। এখানে ১০৪৭২টি মন্ত্র রয়েছে। এগুলো পদ্যে বা ছন্দে রচিত যা একধরনের কবিতা। ঋগ্বেদ অগ্নি, ইন্দ্র, বিষ্ণু, ঊষা, রাত্রি প্রভৃতি দেব-দেবীর স্তুতি ও প্রার্থনামূলক মন্ত্রের সংগ্রহ।

২. **সামবেদ** — সাম মানে গান। এই বেদে সংগৃহীত হয়েছে গান। যজ্ঞ করার সময় কোনো কোনো ঋক্ আবৃত্তি না করে সুর করে গাওয়া হতো। যজ্ঞে দেবতাদের উদ্দেশে এই গান গাওয়া হয়। সামবেদে সর্বমোট ১৮১০টি মন্ত্র আছে।

৩. **যজুর্বেদ** — যজুঃ মানে যজ্ঞ। যজুর্বেদে রয়েছে এমন কিছু মন্ত্র যেগুলো যজ্ঞ করার সময় উচ্চারিত হয়। এখানে যজ্ঞের নিয়ম পদ্ধতিও বর্ণিত হয়েছে। এটি কৃষ্ণ যজুর্বেদ ও শুক্ল যজুর্বেদ নামে দুভাগে বিভক্ত। দুটিতে মোট ৪০৯৯টি মন্ত্র রয়েছে।

৪. **অথর্ববেদ** — চিকিৎসাবিজ্ঞান, বাস্তুকলা ইত্যাদি জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রের জ্ঞান নিয়ে সংকলিত হয়েছে অথর্ববেদ। এখানে প্রায় ৬০০০টি মন্ত্র রয়েছে।

এই যে বেদের চারটি ভাগ, এর একেকটি ভাগকে সংহিতা বলা হয়েছে। যেমন– ঋগ্বেদ সংহিতা, সামবেদ সংহিতা, যজুর্বেদ সংহিতা এবং অথর্ববেদ সংহিতা।

একক কাজ : ছকে প্রদত্ত বেদ-এর বিষয়বস্তু সম্পর্কে কমপক্ষে দুটি বাক্য লিখে ছক পূরণ কর।	ঋগ্বেদ	সামবেদ	যজুর্বেদ	অথর্ববেদ

নতুন শব্দ : স্তুতি, ঋক্, সাম, যজুঃ, সংহিতা, বাস্তুকলা।

পাঠ ৪ : বেদের শিক্ষা ও গুরুত্ব

বেদ পাঠ করলে স্রষ্টা, বিশ্বপ্রকৃতি ও জীবন সর্ম্পকে জ্ঞানলাভ হয়। প্রত্যেকটি বেদের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। ঋগ্বেদ সংহিতা পাঠ করলে আমরা বিভিন্ন দেব-দেবীর সম্পর্কে জানতে পারি। অগ্নি, ইন্দ্র, উষা, রাত্রি, বায়ু প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্তির মাধ্যমে ঈশ্বরের অসীম ক্ষমতা উপলব্ধি করা যায়। তাঁদের কর্মচাঞ্চল্যকে আদর্শ করে, আমরা আমাদের জীবনকে সামনের দিকে এগিয়ে নিতে চেষ্টা করব।

আমরা ঋগ্বেদের মধ্য দিয়ে দেব-দেবীর স্তুতি বা প্রশংসা করতে শিখি। যজুর্বেদ যজ্ঞের মন্ত্রের সংগ্রহ। এ থেকে জানতে পারি সেকালে উপাসনাপদ্ধতি কেমন ছিল। যজুর্বেদ অনুসরণে বিভিন্ন সময়ে যজ্ঞানুষ্ঠানের মাধ্যমে বর্ষপঞ্জি বা ঋতু সম্পর্কে ধারণা জন্মে। বিভিন্নভাবে এবং বিভিন্ন সময়ব্যাপী যজ্ঞানুষ্ঠান করা হতো। যজ্ঞের বেদিনির্মাণের কৌশল থেকেই জ্যামিতি বা ভূমি পরিমাপ বিদ্যার উদ্ভব ঘটেছে। সামবেদ থেকে সেকালের গান ও রীতি সম্পর্কে জানতে পারি।

অথর্ববেদ হচ্ছে চিকিৎসাবিজ্ঞানের মূল। এখানে নানাপ্রকার রোগব্যাধি এবং সেগুলোর প্রতিকারের উপায়স্বরূপ নানা প্রকার লতা, গুল্ম বৃক্ষাদির বর্ণনা করা হয়েছে। আয়ুর্বেদ নামে চিকিৎসাশাস্ত্রের আদি উৎস এই অথর্ববেদসংহিতা। বলা যায়, অথর্ববেদ থেকে জীবনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা যায়। সুতরাং সমগ্র বেদপাঠে পরমাত্মা, বৈদিক দেব-দেবী, যজ্ঞ, সংগীত, চিকিৎসাসহ নানা বিষয়ের জ্ঞান লাভ করে জীবনকে সুন্দর, সুস্থ ও পরিপাটি করে তোলা যায়। আর এজন্যই এ-গ্রন্থ আমাদের প্রত্যেকের পাঠ করা অবশ্যকর্তব্য।

দলীয় কাজ : ছক পূরণ

বেদ-এর শ্রেণিবিভাগ	শিক্ষা
ঋগ্বেদ	
সামবেদ	
যজুর্বেদ	
অথর্ববেদ	

নতুন শব্দ : কর্মচাঞ্চল্য, বর্ষপঞ্জি, স্বরূপ, গুল্ম।

পাঠ ৫ : শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাকে সংক্ষেপে গীতা বলে। মহাভারতের অংশ হয়েও গীতা পৃথক গ্রন্থের মর্যাদা পেয়েছে। মহাভারতের আঠারোটি পর্বের একটি পর্ব হচ্ছে ভীষ্মপর্ব। ভীষ্মপর্বের ২৫ থেকে ৪২– এই আঠারোটি অধ্যায় গীতা নামে পরিচিতি লাভ করেছে। এখানে সর্বমোট সাতশত শ্লোক আছে। এজন্যই এর অপর নাম সপ্তশতী।

ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু দুই ভাই। ধৃতরাষ্ট্র বড়, পাণ্ডু ছোট। ধৃতরাষ্ট্রের একশো ছেলে আর এক মেয়ে। যেমন— দুর্যোধন, দুঃশাসন প্রভৃতি ও মেয়ে দুঃশলা। পাণ্ডুর পাঁচ ছেলে– যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল আর সহদেব। কুরুবংশের নাম অনুসারে ধৃতরাষ্ট্রের সন্তানদের বলা হয় কৌরব। আর পাণ্ডুর নাম অনুসারে তাঁর সন্তানদের বলা হয় পাণ্ডব। রাজ্য নিয়ে এই কুরু-পাণ্ডবের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তখন অবতাররূপে দ্বারকার রাজা ছিলেন। তিনি নিরস্ত্র অবস্থায় অর্জুনের রথের সারথি হয়েছিলেন।

রথ যখন দুপক্ষের সৈন্যদের মাঝখানে রাখা হলো তখন অর্জুন স্বপক্ষ ও বিপক্ষ দলের নিকট আত্মীয়স্বজনদের দেখে মুষড়ে পড়লেন। অতি নিকট আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে। তিনি ঠিক করলেন যুদ্ধ করবেন না। তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তি ইত্যাদি সম্পর্কে বিভিন্ন উপদেশ দেন।

সেই উপদেশবাণীই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বর্ণিত হয়েছে। তাঁর উপদেশ শুনে অর্জুন যুদ্ধ করতে উদ্বুদ্ধ হন। উপলক্ষ অর্জুন হলেও গীতায় ভগবান যে- উপদেশ দিয়েছেন, তা সকল কালের সকল মানুষের জন্য প্রযোজ্য।

একক কাজ : পাণ্ডব ও কৌরবদের বংশধর চিহ্নিত কর।

নতুন শব্দ : সপ্তশতী, সারথি, উদ্বুদ্ধ, কুরু।

পাঠ ৬ : শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ও শ্রীকৃষ্ণের মুখনিঃসৃত বাণী

গীতায় ঈশ্বরের কাছে নিজেকে সমর্পণ করে এবং ফলের আশা না করে নিজের কাজ করতে বলা হয়েছে। কাজটাই বড়, ফল যা-ই হোক। কর্মফলের কথা চিন্তা করতে থাকলে কাজের প্রতি একাগ্রতা আসে না।

এভাবে ফলের আশা না করে কাজ করাকে বলে নিষ্কাম কর্ম। এ প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।

মা কর্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্মণি।। *গীতা-২/৪৭*

অর্থাৎ কর্মেই তোমার অধিকার, কর্মফলে কখনও তোমার অধিকার নেই। কর্মফলের প্রতি তুমি আসক্ত হয়ে যেন নিজ কর্তব্যের প্রতি অবহেলা না করো।

অর্জুন যে আত্মীয়দের সাথে যুদ্ধ করতে চাইছেন না, এতে কোনো লাভ হচ্ছে না। এর কারণ আমাদের জন্ম এবং মৃত্যু ঈশ্বরের হাতে। সুতরাং কারো মৃত্যু অর্জুনের যুদ্ধ করা বা না- করার ওপর নির্ভর করে না। অর্জুন নিজেই কি জানেন কখন তাঁর মৃত্যু ঘটবে! তা ছাড়া ঈশ্বরই আত্মারূপে আমাদের মধ্যে থাকেন। তাই মৃত্যুর মাধ্যমে দেহের ধ্বংস হলেও, আত্মার ধ্বংস হয় না।

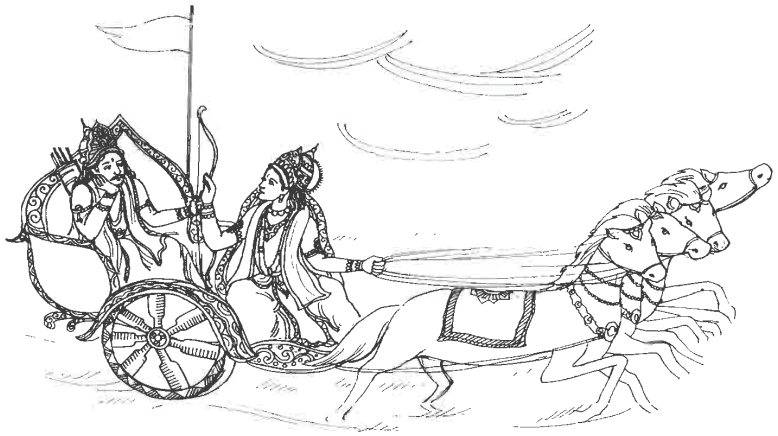

আত্মাকে অগ্নি, বায়ু, জল— কেউ ধ্বংস করতে পারে না।

এক্ষেত্রে বলা হয়েছে—

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ
নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতো য়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥ *গীতা- ২/২০*

অর্থাৎ আত্মার কখনও জন্ম বা মৃত্যু হয় না, অথবা পুনঃ পুনঃ তাঁর উৎপত্তি বা বৃদ্ধি হয় না। তিনি জন্মরহিত, নিত্য, শাশ্বত এবং পুরাণ।

শরীর নষ্ট হলেও আত্মা কখনও বিনষ্ট হয় না। আত্মা সনাতন, অবিনশ্বর। শুধু স্থানান্তর হয়। আত্মাকে এভাবে জানতে পারলে আর দুঃখ থাকে না। তখন সুখ-দুঃখ, জয়-পরাজয় সমান হয়ে যায়।

গীতায় যোগের কথা বলা হয়েছে। যোগ হচ্ছে কর্মের কৌশল বা উপায়। নিষ্কাম কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ বা ভক্তিযোগ দ্বারা ঈশ্বরকে লাভ করা যায়। যিনি ঈশ্বরের সান্নিধ্য বা অনুগ্রহ পাওয়ার জন্য আরাধনা করেন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে ভক্ত বলেছেন। ভক্ত চার রকম, যথা– আর্ত, অর্থার্থী, জিজ্ঞাসু আর জ্ঞানী ভক্ত।

যিনি বিপদে পড়ে ঈশ্বরকে ডাকেন তিনি আর্তভক্ত। যিনি কোনো ইচ্ছা বা প্রার্থনা পূরণের জন্য ঈশ্বরকে ডাকেন, তাঁকে অর্থার্থী ভক্ত বলা হয়। যিনি জ্ঞানের দ্বারা ঈশ্বরকে জানতে চান তিনি হচ্ছেন জিজ্ঞাসুভক্ত। আর যিনি কোনোকিছু পেতে না চেয়ে ঈশ্বরকে ভক্তি করেন এবং তজ্জন্য তাঁকে ডাকেন, তাঁকে জ্ঞানীভক্ত বলা হয়।

গীতা সব উপনিষদের সারকথা। ঈশ্বর বা ব্রহ্ম সর্ম্পকে ধারণা এক জায়গায় সমন্বিতরূপে প্রকাশ করা হয়েছে। গীতামাহাত্ম্যে তাই বলা হয়েছে উপনিষদ যেন গাভীস্বরূপ, আর দুগ্ধ হচ্ছে গীতা। গোবৎস যেমন একটু একটু আঘাত করে দুধ বের করে, অর্জুন তেমনি গোবৎসের মতো প্রশ্ন করে একটু একটু আঘাত করেছেন। আর গীতারূপ দুধ দোহন করেছেন অর্থাৎ গীতারূপ জ্ঞানের কথা স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মুখ থেকে শ্রবণ করেছেন।

একক কাজ : গীতার উপদেশসমূহ চিহ্নিত কর এবং সমাজের মঙ্গলের জন্য তুমি যে- ধরনের কাজ করতে চাও তার একটি তালিকা তৈরি কর।

দলগত কাজ : ছকে উল্লিখিত ভক্ত সম্পর্কে দু/একটি বাক্য লিখে ঘরগুলো যথার্থভাবে পূরণ কর	আর্তভক্ত	অর্থার্থীভক্ত	জিজ্ঞাসুভক্ত	জ্ঞানীভক্ত

নতুন শব্দ : আর্ত, অর্থার্থী, জিজ্ঞাসু, সান্নিধ্য।

পাঠ ৭ : শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার গুরুত্ব

গীতা আমাদের অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার প্রেরণা দেয়। কারণ স্বয়ং ভগবানই যুগে যুগে দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন এবং ধর্মরক্ষার জন্য পৃথিবীতে অবতাররূপে নেমে আসেন।

তিনি বলেছেন—

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজম্যহম্ ॥
পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুস্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।। *গীতা- ৪/৭-৮*

অর্থাৎ যখনই ধর্মের অধঃপতন হয় এবং অধর্মের অভ্যুত্থান, তখনই সাধুদের পরিত্রাণ, দুষ্টলোকদের বিনাশ এবং ধর্ম সংস্থাপন করার জন্য আমি এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হই।

আত্মার ধ্বংস নেই। গীতার এই শিক্ষা আমাদের মৃত্যুকে ভয় না করে ভালো কাজে এগিয়ে যাওয়ার সাহস যোগায়।

গীতায় বলা হয়েছে– ১. শ্রদ্ধাবান ও সংযমীই জ্ঞানলাভে সমর্থ হয় ২. অনাসক্ত কর্মযোগী মোক্ষলাভ করেন

৩. জ্ঞানীভক্তই তাঁকে হৃদয়ে অনুভব করেন এবং ৪. এই বিশাল বিশ্বে যা- কিছু আছে সবই ঈশ্বরের মধ্যে বিদ্যমান।

গীতার এই কথা থেকে আমরা শ্রদ্ধা ও সংযম সাধনার দিকে মনোনিবেশ করি। জাগতিক বিষয়ের প্রতি নির্মোহ হওয়ার প্রেরণা পাই। ধর্ম অনুশীলনের কাজে বিচারে প্রবৃত্ত হই অর্থাৎ অর্থহীন গতানুগতিক পথ পরিহার করে তত্ত্বের মর্মার্থ বোঝবার চেষ্টা করি। সবকিছু ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্গত ভেদবুদ্ধি দূর করে দিয়ে অন্যকে ভালোবাসতে চেষ্টা করি। যে যেভাবে বা যে- পথে ঈশ্বরকে ডাকতে চায় ডাকুক। ঈশ্বর সেভাবেই তার ডাকে সাড়া দেন। এখানেই বেজে ওঠে ধর্মসমন্বয়ের সুর।

গীতায় জ্ঞানের কথা বলা হয়েছে। একই সাথে বাস্তব জীবনে কীভাবে চলতে হবে সেই পথও দেখানো হয়েছে। এসব দিক থেকে হিন্দুদের অন্যতম ধর্মগ্রন্থ হিসেবে গীতার গুরুত্ব অপরিসীম।

একক কাজ : শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার শিক্ষা উপলব্ধি করে তোমার বন্ধুদের সাথে তুমি কীরূপ আচরণ করবে তা ব্যাখ্যা কর।

নতুন শব্দ : সংযমী, মোক্ষ, নির্মোহ, ভেদবুদ্ধি, প্রবৃত্ত ।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ কর :

১. বেদ শব্দের অর্থ .....।
২. বেদে বর্ণিত দেব-দেবীদের ..... ভাগে ভাগ করা হয়েছে।
৩. সমগ্র বেদকে ..... ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে।।
৪. গীতার অপর নাম .....।
৫. ন হন্যতে ..... শরীরে।
৬. চতুর্বেদের প্রত্যেকটিকে বলা হয় .....।

ডানপাশ থেকে শব্দ বা বাক্যাংশ এনে বাম পাশের সাথে মিল কর :

বামপাশ	ডানপাশ
১. সত্য সৃষ্টি করা যায় না	ভেষজ ঔষধের বর্ণনা আছে
২. স্বর্গের দেব-দেবীরা	যজ্ঞের নিয়ম পদ্ধতি আছে
৩. যজুর্বেদ	পৃথিবীতে নেমে আসেন
৪. শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা	উপলব্ধি করা যায়
৫. আয়ুর্বেদে	অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার প্রেরণা দেয়
	সংগীত সম্পর্কে ধারণা আছে

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

১. বৃষ্টি ও শিশিরের দেবতা কে?

ক. অগ্নি খ. ইন্দ্র
গ. সূর্য ঘ. বরুণ

২. সমগ্র বেদে মোট কতটি মন্ত্র আছে?

ক. ১৮১০ খ. ৪০৯৯
গ. ১০৪৭২ ঘ. ২২৩৮১

৩. আমরা ধর্মগ্রন্থ পাঠের মাধ্যমে জানতে পারব

i. ঈশ্বরের বাণী ও মাহাত্ম্য
ii. মঙ্গলজনক উপদেশ
iii. জীবনযাপনের বিধিবিধান

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. i ও ii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের চিত্রটি দেখ এবং ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

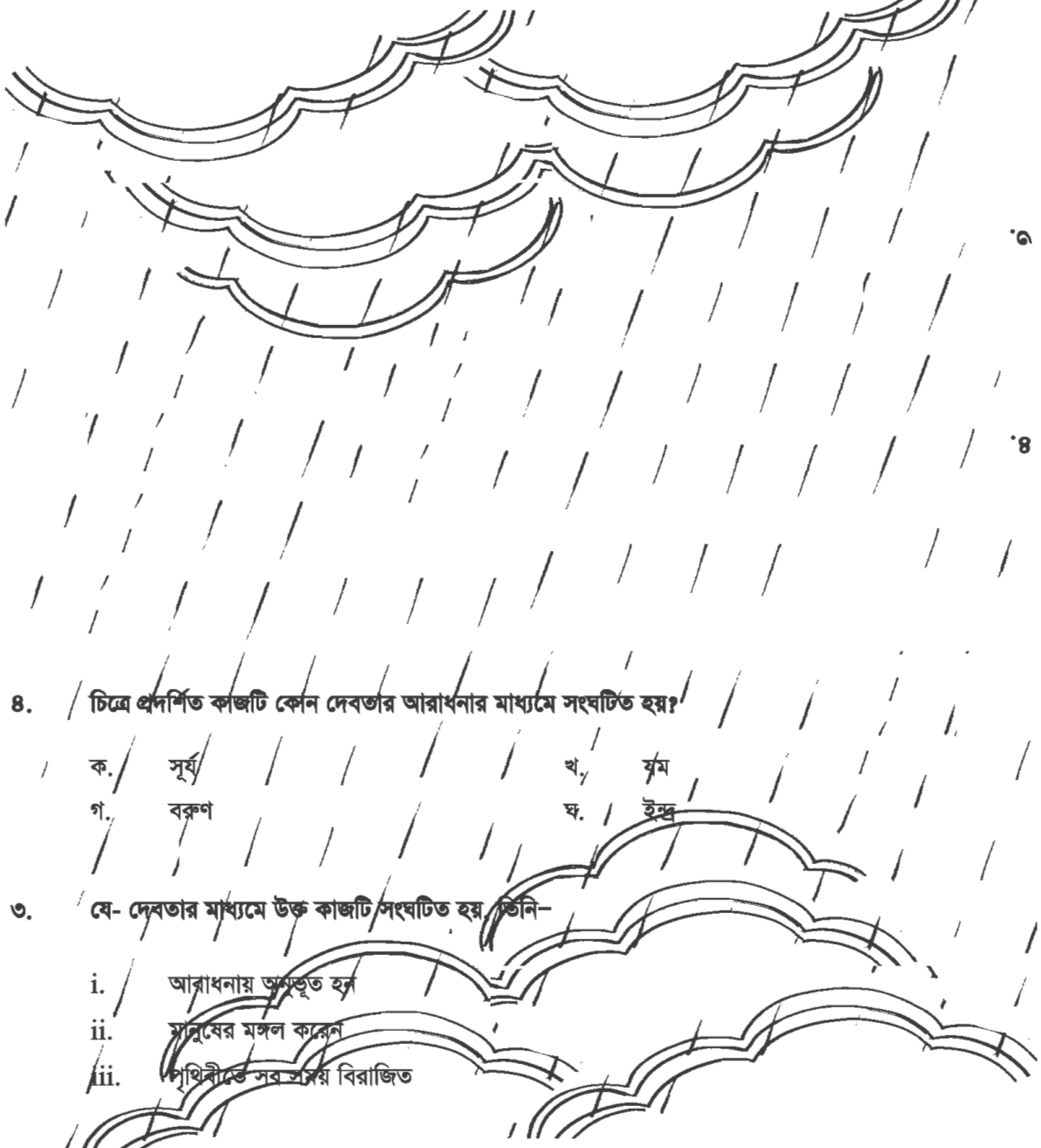

৪. চিত্রে প্রদর্শিত কাজটি কোন দেবতার আরাধনার মাধ্যমে সংঘটিত হয়?

ক. সূর্য খ. যম
গ. বরুণ ঘ. ইন্দ্র

৫. যে- দেবতার মাধ্যমে উক্ত কাজটি সংঘটিত হয়, তিনি–

i. আরাধনায় অনুভূত হন
ii. মানুষের মঙ্গল করেন
iii. পৃথিবীতে সব সময় বিরাজিত

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. i ও ii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১. ধর্মগ্রন্থ বলতে কী বোঝায়?

২. শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে উপদেশ দিয়েছিলেন কেন?

৩. গীতা অনুসারে আত্মার স্বরূপ ব্যাখ্যা কর।

৪. অথর্ববেদের ধারণা ব্যাখ্যা কর।

বর্ণনামূলক প্রশ্ন :

১. 'বেদঃ অখিলধর্মমূলম্'– কথাটি ব্যাখ্যা কর।

২. বৈদিক দেব-দেবীর বৈশিষ্ট্যাবলি বর্ণনা কর।

৩. বেদের সংহিতাগুলো বর্ণনা কর।

৪. শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার উদ্ভবকাহিনী বর্ণনা কর।

৫. 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা' পাঠের গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর।

সৃজনশীল প্রশ্ন :

রমেশ নিয়মিত একখানি বেদ অধ্যয়ন করেন। এই বেদের জ্ঞানের আলোকে তিনি বনের গাছপালা ও লতাপাতা থেকে ঔষধ তৈরি করে জনসাধারণের চিকিৎসাসেবা দিয়ে থাকেন। শুধু তাই নয়, রোগীদের সাথে তিনি ধর্মালাপও করেন। এজন্য বেদের অন্যান্য খণ্ডও তাঁকে অধ্যয়ন করতে হয়। অবশ্য এর আলোকে তিনি নিজেও চেষ্টা করেন পরিশুদ্ধ জীবনযাপনের।

ক. ধ্যান কাকে বলে? ১

খ. প্রাচীনকালের ঋষিদের বেদের দ্রষ্টা বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. রমেশ কোন বেদের জ্ঞানের আলোকে জনসাধারণের চিকিৎসাসেবা দিয়ে থাকেন? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. রমেশের অধ্যয়নকৃত গ্রন্থের জ্ঞানের আলোকে কি পরিশুদ্ধ জীবনযাপন সম্ভব? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন কর। ৪

তৃতীয় অধ্যায়

হিন্দুধর্মের স্বরূপ ও ধর্মবিশ্বাস

হিন্দুধর্ম একটি প্রাচীন ধর্ম। এ ধর্মের প্রকৃত নাম সনাতন ধর্ম। সনাতন শব্দটির অর্থ হচ্ছে চিরন্তন অর্থাৎ যা চিরকাল থাকে। আর সনাতন ধর্ম বলতে এই চিরকালের ধর্মকেই বোঝায়। তবে সনাতন ধর্ম কালের প্রবাহে এক সময়ে হিন্দুধর্ম নামে পরিচিত হয়। দেব-দেবীর পূজা অর্চনা এ হিন্দুধর্মের একটি বিশেষ দিক। এই ধর্মের মূলে রয়েছেন ভগবান। তাঁর অনুগ্রহলাভের জন্য মানুষের ধর্মাচরণ করতে হয়। মানুষ ভক্তিভরে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করলে ভগবান তাদের মনোবাঞ্ছা পূরণ করেন। বাস্তব জীবনে মা-বাবা সন্তানের লালনপালন ও সুখ সমৃদ্ধির ব্যবস্থা করে থাকেন। সন্তানের উচিত দেবতাজ্ঞানে মা-বাবার সেবা-শুশ্রূষা করা। একই সাথে সমাজের অন্যান্য গুরুজনকে শ্রদ্ধা করা। এ অধ্যায়ে সনাতন ও হিন্দুধর্মের সম্পর্ক, হিন্দুধর্মের উৎপত্তির ইতিহাস এবং ধর্মবিশ্বাসের অঙ্গ হিসেবে গুরুজনে ভক্তি, মাতৃভক্তি, কর্তব্যবোধ ইত্যাদি দৃষ্টান্তমূলক উপাখ্যানসহ আলোচিত হয়েছে।

এ অধ্যায়- শেষে আমরা–

- সনাতন ও হিন্দু শব্দ দুটির অর্থ ব্যাখ্যা করতে পারব
- সনাতন ধর্ম ও হিন্দুধর্ম – এ ধারণা দুটি ব্যাখ্যা করতে পারব
- হিন্দুধর্মের উৎপত্তির ইতিহাস সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করতে পারব
- হিন্দুধর্মের সমৃদ্ধ ঐতিহ্য নিয়ে গর্ববোধ করব
- ধর্মবিশ্বাস ধারণাটি ব্যাখ্যা করতে পারব
- গুরুজনে ভক্তি ধারণাটি ব্যাখ্যা করতে পারব
- কীভাবে গুরুজনকে ভক্তি করতে হয় তা বর্ণনা করতে পারব
- মাতৃভক্তির একটি গল্প বর্ণনা করতে পারব
- ধর্মের আলোকে কর্তব্যবোধের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব
- মাতা-পিতার প্রতি সন্তানদের কর্তব্য এবং সন্তানের প্রতি মাতা-পিতার দায়িত্ব ও কর্তব্য ব্যাখ্যা করতে পারব
- গুরুজনে ভক্তি ও কর্তব্য পালনে সচেতন হব।

প্রথম পরিচ্ছেদ :
হিন্দুধর্মের স্বরূপ

পাঠ ১ : সনাতন ধর্মই হিন্দুধর্ম

সনাতন ধর্ম ও হিন্দুধর্ম মূলত একই ধর্ম। অন্য কথায়, সনাতন ধর্মের অপর নাম হিন্দুধর্ম। সনাতন শব্দের অর্থ চিরন্তন। যা অতীতে ছিল বর্তমানে আছে এবং ভবিষ্যতে থাকবে, সেটি সনাতন। সনাতন শব্দটিতে চিরদিনের কথা নির্দেশ করা হয়। সময়ের পরিবর্তনেও যার কোনো পরিবর্তন হয় না সেটিই সনাতন। 'হিন্দু' শব্দটি এসেছে সিন্ধু শব্দ থেকে। সিন্ধুনদ প্রাচীনকাল থেকে প্রবাহিত। এই নদের তীরে প্রাচীনকালে সনাতনধর্মের লোক বাস করত। তাদের আচার-আচরণ, ধর্মবিশ্বাসে একটি বিশিষ্ট রূপ ছিল।

বিদেশিদের কাছে এদের পরিচয় হয় ঐ সিন্ধুনদের নামে। এই বিদেশিরাই সিন্ধু শব্দকে হিন্দু বলে উচ্চারণ করত। আর সেখানকার সনাতন ধর্মের লোকদেরকে তারা বলত হিন্দু। হিন্দুদের সনাতন ধর্মই তাদের ভাষায় হয়ে ওঠে 'হিন্দুধর্ম'।

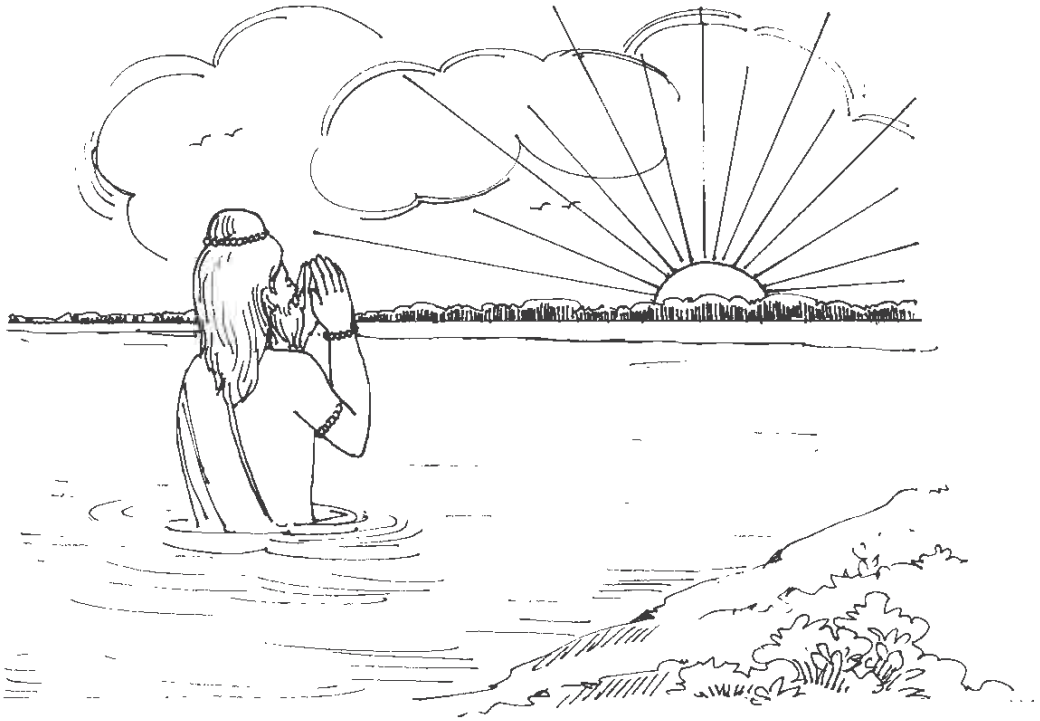

এ ধর্ম অতি প্রাচীন ধর্ম। সময়ের অগ্রগতিতেও এ ধর্মের মূল ধারণাগুলোর কোনো পরিবর্তন নেই। তবে দেশ-কালের প্রয়োজনে মাঝেমধ্যে এ ধর্মের নতুন চিন্তা-চেতনা সংযুক্ত হয়েছে। নতুন নামকরণ হয়েছে হিন্দুধর্ম। এভাবেই সনাতন ধর্মের বিকাশ ঘটেছে।

মোটকথা, সনাতন ধর্মের নতুন পরিচয় হচ্ছে হিন্দুধর্ম নামে। সনাতন ধর্মে যে চিন্তা-চেতনা সেটিই হিন্দুধর্মের চিন্তা-চেতনা। হিন্দুধর্মের মূল ধর্মবোধ হচ্ছে– ঈশ্বরে বিশ্বাস, কর্মফলে বিশ্বাস, জন্মান্তরে বিশ্বাস, ঈশ্বরজ্ঞানে জীবসেবা, দেব-দেবীর পূজা-পার্বণ, জগতের কল্যাণসাধন ইত্যাদি।

নতুন শব্দ : চিরন্তন, কর্মফল, সনাতন, জন্মান্তর।

পাঠ ২ : হিন্দুধর্মের উৎপত্তি

হিন্দুধর্মের উৎপত্তির ইতিহাস সনাতন ধর্মের পরিচিতির মধ্যেই বর্তমান। সনাতন ধর্ম কোনো একজন মাত্র মুনি, ঋষি বা অবতারপুরুষের প্রতিষ্ঠিত ধর্ম নয়। আদিম মানুষের মনে যখন সত্যমিথ্যা, ন্যায়-অন্যায়বোধ জেগেছিল– এক কথায়, ধর্মবোধ জেগেছিল, সেখান থেকে এ ধর্মের বিকাশ শুরু। আর সমাজের চিন্তাশীল ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিদের ধ্যান-ধারণার ফসল নিয়ে এ ধর্ম ক্রমশ বিকাশ লাভ করে।

সনাতন ধর্মের মূলে রয়েছেন স্বয়ং ভগবান। এই ভগবান বা স্রষ্টা জগৎসৃষ্টির সাথে সাথে ধর্মেরও সৃষ্টি করেছেন। মানুষের জীবন সুন্দর ও সুখময় করার জন্যই ধর্ম এসেছে। সনাতন ধর্মের মূল বিশ্বাস হচ্ছে স্রষ্টা বা ভগবান আছেন। তাঁর সৃষ্ট জগতে মানুষকে কাজ করতে হচ্ছে। আর প্রতিটি কাজের যে- ফল সেটিও মানুষকে ভোগ করতে হয়। একেই বলে কর্মফল– যা জন্মান্তরেও ভোগ করতে হয়। এর ফলে আসে জন্মান্তরের কথা। অমঙ্গল ও দুষ্টজনের অত্যাচার থেকে জগৎকে মুক্ত করার জন্য ভগবান অবতাররূপে অবির্ভূত হন। ঈশ্বরের উপাসনা, নামজপ, কীর্তন এবং দেব-দেবীর পূজা-অর্চনা, ধ্যান-ধারণা ইত্যাদি ধর্মকর্মের অনুশীলন করে মানুষ সুখ শান্তি এবং মুক্তি লাভ করতে পারে।

সনাতন ধর্ম চিন্তায় যেমন ছিল পুনর্জন্ম, অবতার ও মোক্ষলাভের কথা– এ সবই রয়েছে হিন্দুধর্মে। তবে ধর্ম আচরণের পদ্ধতি হিসেবে কিছু- কিছু পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। সনাতন বা হিন্দুধর্মের প্রাচীনকালে ধর্মানুষ্ঠান ছিল যজ্ঞক্রিয়া। সেটি ক্রমে দেব-দেবীর আরাধনায় রূপ নিয়েছে। যজ্ঞকর্মে দেব-দেবীর শক্তি ও রূপের বর্ণনা নিয়ে যজ্ঞক্রিয়া হতো। পরবর্তীকালে ঐ দেব-দেবীরই রূপ কল্পনা করে মূর্তির মাধ্যমে পূজা-অর্চনার ব্যবস্থা হয়। সনাতন ধর্মের যে অবতার ও মোক্ষলাভের বিষয় রয়েছে এ সবই হিন্দুধর্মের সম্পদ। তবে ক্রমবিকাশের স্তরে স্তরে হিন্দুধর্মে আচার-আচরণে কিছু- কিছু নতুনত্বও এসেছে। বৈদিক যুগের যজ্ঞক্রিয়া পূজা অর্চনার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে আধুনিক হিন্দুধর্মে শুধু ঈশ্বরের নাম ও গুণকীর্তনের প্রচলন হয়েছে।

সনাতন ধর্মের জনগণ ভারতীয় উপমহাদেশে সিন্ধুনদের তীরে বসবাস করত। তাদের আচার-আচরণ, পোশাক-পরিচ্ছদ ধর্মচর্চার একটি বিশিষ্ট রূপ ছিল। এদেশের বাইরে থেকে ইরান, গ্রিস প্রভৃতি দেশের জনগোষ্ঠী এখানে আসে। তারা সিন্ধুনদের তীরবর্তী লোকদেরকে একটি ভিন্ন মানবগোষ্ঠী মনে করত। আগেই বলা হয়েছে, ঐ বিদেশিরা তাদেরকে সিন্ধুনদের সঙ্গে যুক্ত করে পরিচয় দিত। বিদেশিদের উচ্চারণে সিন্ধু শব্দটির 'স'- এর স্থলে 'হ' হয়ে উচ্চারিত হয়। ফলে সিন্ধু শব্দটি হয়ে পড়ে হিন্দু শব্দ। আর সিন্ধুনদের তীরবর্তী লোকজনকে ঐ বিদেশিদের ডাকে হিন্দু হয়ে যায়। আর এটি আস্তে আস্তে দক্ষিণ- পূর্ব অঞ্চলে বিস্তৃত হয়ে পড়ে। এর ফলে এদেশে সনাতন ধর্মের অনুসারী মাত্রই হিন্দু নামে পরিচিত হয়।

হিন্দুধর্মের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ঈশ্বরে বিশ্বাস, ঈশ্বরজ্ঞানে জীবসেবা এবং একই সঙ্গে জগতের কল্যাণসাধন। এখানে রয়েছে ঈশ্বর আরাধনার বিষয়ে স্বাধীনভাবে চিন্তা করার সুযোগ। আর এ সুযোগের মধ্য দিয়ে মানুষ ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের সহজ সরল রূপ পেয়ে যায়। এভাবে এ ধর্মের অনুসারীরা মুক্তচিন্তার অধিকার পেয়ে গর্ববোধ করেন।

একক কাজ : * সনাতন ধর্ম কীভাবে হিন্দুধর্ম নামে নামান্তরিত হলো? বুঝিয়ে লেখ।

নতুন শব্দ : সনাতন, অবতার, সিন্ধুনদ, যজ্ঞক্রিয়া, মোক্ষলাভ।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ কর :

১. সিন্ধুনদ ..... থেকে প্রবাহিত।

২. সনাতন শব্দের অর্থ.....।

৩. সনাতন ধর্মের মূলে রয়েছে ..... ভগবান।

৪. হিন্দুধর্ম ..... নতুন ধর্ম নয়।

ডানপাশ থেকে শব্দ বা বাক্যাংশ এনে বাম পাশের সাথে মিল কর :

বামপাশ	ডানপাশ
১. হিন্দু শব্দটি এসেছে	করার জন্যই ধর্ম এসেছে
২. বিদেশিরা সিন্ধু শব্দকে হিন্দু বলে	যজ্ঞ ক্রিয়া
৩. মানুষের জীবন সুন্দর, সুখময়	গাছপালা
৪. প্রাচীনকালে ধর্মানুষ্ঠান ছিল	সিন্ধু শব্দ থেকে
৫. আধুনিক হিন্দুধর্মে শুধু ঈশ্বরের নাম ও গুণকীর্তনের	প্রচলন হয়েছে
	উচ্চারণ করে

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

১. হিন্দু শব্দটি কোন শব্দ থেকে এসেছে?

ক. হিন্দি খ. সিন্ধী

গ. সিন্ধু ঘ. হিন্দ্

২. সনাতন ধর্মের মূলে কে রয়েছেন?

ক. ব্রহ্মা খ. ভগবান

গ. বিষ্ণু ঘ. শিব

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

অনুপমা দেবী ঘরে নিয়মিত পূজা অর্চনা করার পাশাপাশি তিথি অনুসারে বিভিন্ন দেবদেবীর আরাধনাও করেন।

৩. অনুপমা দেবীর আচরণে কোন বিশ্বাসটি বেশি সক্রিয়?

ক. পূজা খ. কর্ম
গ. ধর্ম ঘ. যোগ

৪. অনুপমা দেবী ইহকাল ও পরকালে লাভ করতে পারেন–

i. সুখ
ii. শান্তি
iii. মুক্তি

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১. সনাতন শব্দটি দ্বারা কী বোঝায়?
২. কীভাবে 'হিন্দু' শব্দটি প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে?
৩. ভগবান অবতাররূপে এসে কী করেন?
৪. মানুষ ধর্মকর্মের অনুশীলন করে কেন?

বর্ণনামূলক প্রশ্ন :

১. সনাতন ও হিন্দু শব্দ দুটি ব্যাখ্যা কর।
২. হিন্দুধর্মের উৎপত্তির ইতিহাস বর্ণনা কর।
৩. যজ্ঞ করার আবশ্যকতা ব্যাখ্যা কর।
৪. মানুষের জন্মান্তর হয় কেন?

সৃজনশীল প্রশ্ন :

কবিতা তার মায়ের সাথে একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে গিয়ে দেখল, ব্রাহ্মণ আগুন জ্বালিয়ে তার মধ্যে বিভিন্ন উপকরণ দিয়ে দেবতাদের আহ্বান জানাচ্ছেন। ঠিক একই অবস্থা সে দেখতে পেল দুর্গাপূজার সময় এবং মাকে সে এই বিষয়ে বিভিন্ন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে। তার মা প্রশ্নের উত্তরগুলো তাকে বুঝিয়ে বলেন।

ক.	সনাতন ধর্মের মূলে কে রয়েছেন?	১
খ.	সনাতন ধর্মকে হিন্দুধর্ম বলার কারণ ব্যাখ্যা কর।	২
গ.	ব্রাহ্মণ কোন কাজের মাধ্যমে দেবতাদের আহ্বান করেছেন? হিন্দুধর্মের উৎপত্তির আলোকে ব্যাখ্যা কর।	৩
ঘ.	'প্রতিমাপূজার উৎপত্তির সাথে ব্রাহ্মণের উক্ত কাজটির গভীর সম্পর্ক রয়েছে।' উত্তরের সপক্ষে তোমার যুক্তি প্রদর্শন কর।	৪

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : ধর্মবিশ্বাস

পাঠ ১ : ধর্মবিশ্বাস ও ভক্তি

হিন্দুধর্ম কতিপয় বিশ্বাসের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। এ বিশ্বাসগুলোকে এক কথায় বলা হয় ধর্মবিশ্বাস। ধর্মকর্ম অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে মানুষ কল্যাণ লাভ করে। ধর্ম শব্দটির বিশেষ অর্থ হচ্ছে ধরে রাখার ক্ষমতা। ধর্ম মানুষকে কল্যাণের পথে চলার নির্দেশ দেয়। ধর্ম আচরণের রীতি-নীতি মানুষকে সুন্দর জীবনপথে চলতে সাহায্য করে। জীবনের কল্যাণচিন্তা, ভালোভাবে জীবনযাপনের নির্দেশ লাভ করা যায় ধর্ম থেকে। ধর্মের বিধিবিধান মেনে চলেই মানুষ ইহাকালে ও পরকালে মঙ্গল লাভ করতে পারে।

ধর্ম হচ্ছে ধারণশক্তি যা ধারণ করে মানুষের জীবন বিকশিত হয় ও সার্থক হয়। ধর্মের এই গুণাবলি এবং এগুলোর প্রতি যে- বিশ্বাস, তাকেই এক কথায় ধর্মবিশ্বাস বলা যায়।

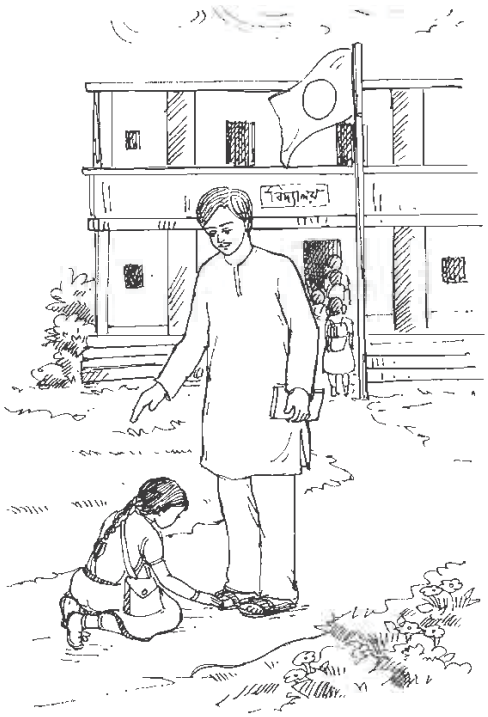

ভক্তিও ধর্মের অঙ্গ। কোনো দেবতা কিংবা কোনো বিষয়ের জ্ঞানবান ব্যক্তির প্রতি যে গভীর শ্রদ্ধা সেটিই ভক্তি। আর এই ভক্তিভাবটি ফুটে ওঠে দেবতা বা গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণে। ভক্ত গুরুজনের নিকট থেকে জ্ঞানলাভে সমর্থ হয়। জ্ঞানী ব্যক্তির নিকট থেকে জ্ঞান আহরণ করতে হয়। আর এজন্য তার করণীয় হচ্ছে জ্ঞানীর নিকট উপস্থিত হয়ে বিনীতভাবে তাঁকে প্রণাম করা, তাঁর অনুমতি নিয়ে বসা। তারপর গুরুকে বিনীতভাবে কিছু জানার জন্য প্রশ্ন করা। এই যে গুরুকে প্রণাম করা, তাঁর নিকট বসা ও তাকে প্রশ্ন করা– এ কাজগুলোর মধ্য দিয়ে যে- ভাবটি প্রকাশিত হলো তাকেই বলে ভক্তি। গুরুজন হতে পারেন শিক্ষক, ধর্মগুরু, পিতা-মাতা অথবা যে-কোনো সম্মানীয় ব্যক্তি।

প্রাণিজগতের মধ্যে মানুষ শ্রেষ্ঠ। তার এই শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে ধর্মবোধের মধ্যে। অন্যান্য প্রাণীর সঙ্গে তার অনেক মিল রয়েছে। প্রাণীদের খাবার, বিশ্রাম, প্রয়োজন হয়। মানুষেরও এসব আছে। তবে প্রাণীরা তাদের স্বভাব নিয়েই থাকে। কিন্তু মানুষ তার বুদ্ধি, বিবেক নিয়ে সুন্দর কল্যাণকর জীবন লাভ করতে পারে। আর এ সমস্ত সুন্দর আচরণের মূলে রয়েছে ধর্মের নির্দেশনা। ধর্ম মানুষকে ভালো মন্দের নির্দেশ দেয়। ভালো কাজ করে মানুষ নিজের ও অপরের মঙ্গল করতে পারে। আবার খারাপ কাজে মানুষ নিজের ও অপরের ক্ষতি করে থাকে। তাই জীবনকে সুন্দর করতে, আনন্দময় করতে ধর্মের বিধিনিষেধ মেনে চলা প্রয়োজন। ধর্ম মানুষের নির্ভরযোগ্য বন্ধু। ইহকাল ও পরকালে ধর্ম মানুষকে সুফল, সৌভাগ্য, প্রশান্তি দিয়ে থাকে। তাই ধর্মের নির্দেশিত কর্ম অনুশীলন করা কর্তব্য। যা করা উচিত সেটিই কর্তব্য। ধর্মের বিধিনিষেধ মেনে চলাই ধার্মিকের কর্তব্য।

সমাজজীবনে মাতা-পিতার প্রতি সন্তানের কর্তব্য রয়েছে, আবার সন্তানের প্রতিও মাতা-পিতার দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। মাতা-পিতার মাধ্যমেই সন্তানের জন্ম। শিশু অবস্থা থেকে মাতা-পিতার যত্নে-আদরে সন্তান বড় হতে থাকে। অসহায় অবস্থা থেকে শিশু ক্রমে বড় হয়, জ্ঞান-বুদ্ধি অর্জন করে। সে বুঝতে পারে, মাতা-পিতার স্নেহ যত্নের কথা। তখন এই মাতা-পিতার প্রতি সন্তানেরও কর্তব্যবোধ জাগে। বুঝতে পারে তাঁদের খুশি রাখা, তাঁদের সেবা-যত্ন করা কর্তব্য। ধর্মের দৃষ্টিতে মা-বাবা হচ্ছেন প্রত্যক্ষ দেবতা। তাঁদের তুষ্টিতেই ভগবান তুষ্ট হন।

আবার সন্তানের প্রতিও মা-বাবার কর্তব্য রয়েছে। সন্তানকে সেবা-যত্ন দিয়ে লালনপালন করা মা-বাবার কর্তব্য। সন্তান যাতে সৎপথে চলে, সুন্দর-আলোকিত জীবন লাভ করতে পারে সেদিকে মা-বাবার লক্ষ রাখতে হবে। বাল্য হতে বিদ্যাশিক্ষা, গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধা ও কর্তব্যবোধ সম্পর্কে সচেতন করে সন্তানকে গড়ে তোলা মাতা-পিতার কর্তব্য।

নতুন শব্দ : বিধান, ইহকাল, পরকাল, শ্রেষ্ঠত্ব, বিধিনিষেধ, কর্তব্যবোধ।

দলীয় কাজ : ভক্তি ও শ্রদ্ধা সম্পর্কে পাঁচটি করে বাক্য লেখ ।

এ প্রসঙ্গে মাতৃভক্ত গণেশ ও কার্তিকের গল্পটি স্মরণ করা যায়।

পাঠ ২ : গণেশের মাতৃভক্তি

মা দুর্গার ছেলে গণেশ ও কার্তিক। গণেশের দেহটি মোটাসোটা ; তাঁর বাহন ইঁদুর। অপরদিকে কার্তিকের সুঠাম বলিষ্ঠ দেহ ; তাঁর বাহন ময়ূর। মা দুর্গা ঘোষণা করলেন, যে আগে পৃথিবী ঘুরে এসে মাকে প্রণাম করতে পারবে তাকেই তিনি গলার হার দেবেন। দুই ভাইয়ের মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হলো। গণেশ দেখলেন তাঁর বাহন ইঁদুরকে নিয়ে কার্তিকের বাহন ময়ূরকে হারানো সম্ভব নয়। তখন গণেশের মনে হলো, মাতা জগৎরূপিণী; তিনিই পৃথিবী। তাঁর চারিদিকে ঘুরে আসলেই পৃথিবী ঘোরা হয়ে যাবে। এই চিন্তা করে গণেশ ভক্তিভরে মায়ের চারিধার ঘুরে এসে মাকে প্রণাম করলেন। অপরদিকে কার্তিক দ্রুত গতিতে পৃথিবী ঘুরে এসে দেখেন গণেশের গলায় মা হারটি পরিয়ে দিয়ে গণেশকে কোলে নিয়ে বসে আছেন। এ-ঘটনার কারণ জানতে চাইলে মা দুর্গা কার্তিককে বললেন, গণেশ অত্যন্ত জ্ঞানী। সে জানে মাতাই পৃথিবী। তাই তাঁর চারপাশে ঘুরলে পৃথিবী ঘোরা হয়। গণেশের এ মাতৃভক্তি জগতে অমর হয়ে রয়েছে। সকল ছেলে-মেয়েরই উচিত মাতা-পিতাকে দেবতাজ্ঞানে ভক্তি করা, সেবা করা।

নতুন শব্দ : ভক্তি, ধর্মবিশ্বাস, কর্তব্য, বাহন, প্রতিযোগিতা, জগৎরূপিণী, মাতৃভক্তি।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ কর :

১. ধর্ম মানুষকে কল্যাণের পথে ..... নির্দেশ দেয়।

২. ধর্ম হচ্ছে ..... শক্তি।

৩. জ্ঞানী ব্যক্তির নিকট থেকে ..... আহরণ করতে হয়।

৪. গুরুজন হতে পারেন ..... ধর্মগুরু, পিতা-মাতা।

ডানপাশ থেকে শব্দ বা বাক্যাংশ এনে বাম পাশের সাথে মিল কর :

বামপাশ	ডানপাশ
১. ধর্মের প্রতি বিশ্বাসকে এক কথায়	নির্ভরযোগ্য বন্ধু
২. ধর্মের অঙ্গ হিসেবে ভক্তিভাবটি	প্রত্যক্ষ দেবতা
৩. ধর্ম মানুষের	বলা হয় ধর্ম বিশ্বাস
৪. ধর্মের দৃষ্টিতে মা-বাবা হচ্ছেন	মা-বাবার কর্তব্য
৫. সন্তানকে সেবাযত্ন দিয়ে লালন করা	প্রকাশ হয়ে যাবে
	বিশ্বাস দৃঢ় করে

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

১. গণেশদেবের বাহন কী?

ক. হাঁস খ. পেঁচা

গ. ইঁদুর ঘ. ময়ূর

২. প্রাণিজগতের মধ্যে মানুষ–

i. বুদ্ধিমান

ii. সুচতুর

iii. বিচক্ষণ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৩. বাঁধন প্রতিদিন সকালে তার আরাধ্য দেবতার পূজা না করা পর্যন্ত অন্য কোনো কাজ করে না। এখানে বাঁধনের ধর্মীয় আচরণের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে-

i. ধর্মীয় বিশ্বাস
ii. মঙ্গলচিন্তা
iii. কুসংস্কার

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. i ও ii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১. আমরা ধর্মে বিশ্বাস করব কেন?
২. হিন্দু শব্দটির কীভাবে উৎপত্তি হয়েছে?
৩. জ্ঞানলাভের উপায়সমূহ লেখ।
৪. দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর।

বর্ণনামূলক প্রশ্ন :

১. ধর্মপালনের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা কর।
২. ধর্মাচরণে ভক্তির প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর।
৩. সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার কর্তব্যসমূহ চিহ্নিত কর।
৪. গণেশদেবের মাতৃভক্তির শিক্ষা তুমি ব্যক্তিজীবনে কীভাবে প্রয়োগ করবে?

সৃজনশীল প্রশ্ন :

বিধান ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়া অবস্থায় তার বাবা অসুস্থ হয়ে পড়ে। তিনিই ছিলেন সংসারের একমাত্র উপার্জনকারী ব্যক্তি। এদিকে ডাক্তার বলেছেন যে, তার পিতাকে সুস্থ করে তুলতে পাঁচ লক্ষ টাকা প্রয়োজন। কোনো উপায় না দেখে বিধানের মা হতাশ হয়ে পড়ে। বাংলাদেশ টেলিভিশনে একটি অনুষ্ঠানে দেখেছিল, উপস্থাপক একজন দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত রোগীর জন্য সহায়তা চাইছিলেন। বিধান ঐ অনুষ্ঠানের প্রযোজকের নিকট যায়। তিনি বিধানের কথা শুনে, তার বাবার কথা সম্প্রচার করেন। বিধানের বাবার চিকিৎসার ব্যবস্থা হয়। তার বাবা সুস্থ হয়ে বিধানের পড়াশুনা ঠিকমতো চালিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করেন। শেষ পর্যন্ত ছেলের ডাক্তারি পড়ার খরচ চালাতে গিয়ে নিজেদের বাড়িটিও বিক্রি করে দেন। বিধান আজ সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত ডাক্তার।

ক. গণেশের বাহন কী? ১
খ. মানুষের ধর্মীয় বিধিবিধান মেনে চলার মূল কারণ ব্যাখ্যা কর। ২
গ. বিধানের পিতার মধ্যে 'ধর্মবিশ্বাস' পরিচ্ছেদের যে- দিকটি ফুটে উঠেছে তা ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. বিধানের মধ্যে 'গুরুভক্তি' কাজ করেছে কি? 'ধর্মবিশ্বাস' পরিচ্ছেদের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

চতুর্থ অধ্যায়
নিত্যকর্ম ও যোগাসন

প্রতিদিনের কাজকেই বলা হয় নিত্যকর্ম। যেমন– প্রতিদিন প্রভাতে সূর্যপ্রণাম একটি নিত্যকর্ম। নিত্যকর্ম মেনে চললে একদিকে নিয়মানুবর্তিতা শেখা যায় অপরদিকে ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করা যায়। ঈশ্বর-আরাধনার একটি পদ্ধতি হচ্ছে যোগ। যোগ বলতে বোঝায় ভগবান ও তাঁর সত্যচেতনার সঙ্গে যোগস্থাপন। আসন হচ্ছে যোগের একটি অঙ্গ। স্থির ও সুখাবহ অবস্থিতির নামই আসন। যোগাসন অনুশীলনে কতগুলো সাধারণ নিয়ম মেনে চলতে হয়। তবেই এর সুফল পাওয়া যায়। নিয়মিত যোগাসন অনুশীলনে দেহকে বিভিন্ন রোগ থেকে দূরে রাখা যায়।

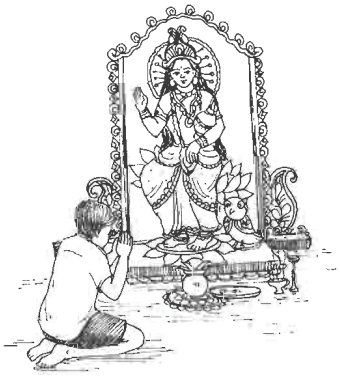
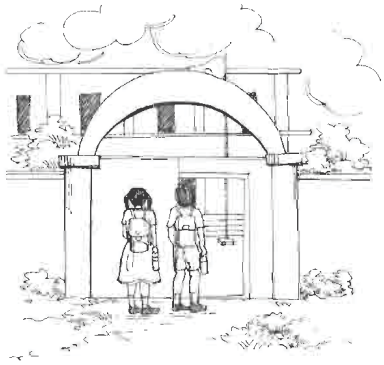
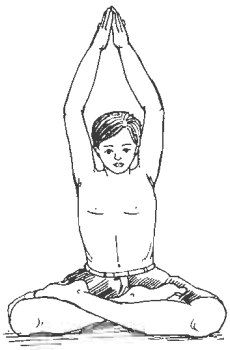

ফলে শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ, সবল ও সুন্দর হয়ে ওঠে, এবং মনও হয়ে ওঠে আনন্দ ও শান্তিময়। সুতরাং দেহ ও মনকে সুস্থ রাখতে আসনের গুরুত্ব অপরিসীম। এই অধ্যায়ে নিত্যকর্ম ও যোগাসন সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

এ অধ্যায়-শেষে আমরা–

- নিত্যকর্ম ধারণাটি ব্যাখ্যা করতে পারব
- নিত্যকর্মের একটি মন্ত্র বা শ্লোক সরলার্থসহ বলতে এবং ব্যাখ্যা করতে পারব
- জীবনাচরণে নিত্যকর্মের গুরুত্ব ও প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারব
- যোগাসনের ধারণা, সাধারণ নিয়ম ও গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব
- সিদ্ধাসন ও শবাসনের ধারণা ব্যাখ্যা করতে এবং অনুশীলন- পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারব
- শরীর-মন গঠনে সিদ্ধাসন ও শবাসনের গুরুত্ব ও প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারব
- নিত্যকর্ম পালন এবং সিদ্ধাসন ও শবাসন করতে উদ্বুদ্ধ হব
- নিত্যকর্ম, সিদ্ধাসন ও শবাসন অনুশীলন করতে পারব।

পাঠ ১ : নিত্যকর্মের ধারণা ও মন্ত্র

পৃথিবী বিরাট কর্মক্ষেত্র। এখানে সকলকেই কিছু- না- কিছু কর্ম করতে হয়। কেননা জাগতিক কর্ম ছাড়া জীবনধারণ করা যায় না । তাই কর্মকে জীবন এবং ধর্ম বলা যায়। আমরা প্রতিদিন যেসকল কাজ করে থাকি তা-ই 'নিত্যকর্ম'।

'নিত্য' অর্থ প্রত্যহ বা প্রতিদিন। 'কর্ম' মানে কাজ। সুতরাং শাব্দিক অর্থে নিত্যকর্ম বলতে বোঝায় প্রতিদিন যে- কাজ সম্পন্ন করতে হয়। অর্থাৎ প্রতিদিনের কাজকেই বলা হয় নিত্যকর্ম। প্রতিদিনের কর্মসূচি ঠিক করে প্রতিদিনই নিয়মিতভাবে পালন করতে হয়। মোটকথা প্রতিদিন ঘুম থেকে উঠে সারাদিন ধরে এবং রাতে ঘুমাতে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত যে- কাজ নিষ্ঠার সাথে পালন করা হয় সেগুলোকে নিত্যকর্ম বলে।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ভোরে ঘুম থেকে উঠে ঈশ্বর ও গুরুর নাম স্মরণ করা, পিতামাকে প্রণাম করা, হাত-মুখ ধুয়ে স্নান করে পূজা ও উপাসনা করা, লেখাপড়া, খেলাধুলা ও ব্যায়াম করা ইত্যাদি।

নিত্যকর্মের মন্ত্র :

প্রতিদিন প্রভাতে সূর্যপ্রণাম একটি নিত্যকর্ম। সূর্যকে নিম্নলিখিত মন্ত্রে প্রণাম জানাতে হয় :

ওঁ জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্

ধ্বান্তারিং সর্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্ ॥

সরলার্থ : কশ্যপের পুত্র, জবাফুলের মতো রক্তবর্ণ, মহাদ্যুতিময়, অন্ধকার দূরকারী, সর্বপাপ বিনাশকারী সূর্যকে আমি প্রণাম জানাই।

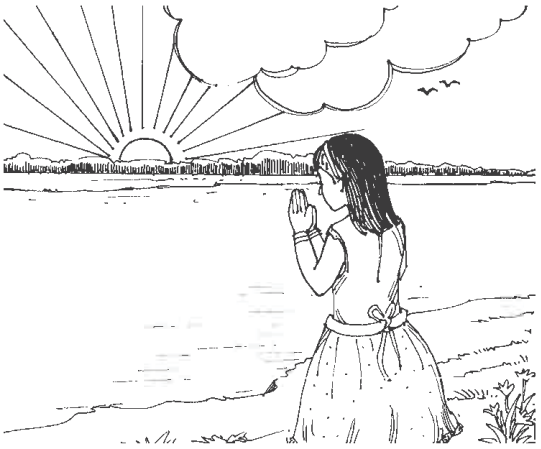

দলীয় কাজ :
* সূর্যদেবতার প্রণাম মন্ত্রটি আবৃত্তি কর।
* সূর্যদেবতার পাঁচটি বৈশিষ্ট্য লেখ।
* প্রতিদিনের নিত্যকর্মের একটি তালিকা তৈরি কর।

নতুন শব্দ : নিত্য, প্রত্যহ, সম্পন্ন, জাগতিক, স্মরণ, সঙ্কাশং, কাশ্যপেয়ং, মহাদ্যুতিম্, ধ্বান্তারিং, সর্বপাপঘ্নং, প্রণতোঽস্মি ।

পাঠ ২ : নিত্যকর্মের প্রভাব ও গুরুত্ব

নিত্যকর্ম করলে নিয়মানুবর্তিতা শেখা যায়। সময়ের কাজ সময়ে শেষ হয় ; কোনো কাজই একেবারে অসমাপ্ত পড়ে থাকে না। কাজে নিষ্ঠাবান হওয়া যায় এবং শৃঙ্খলা বজায় থাকে। নিয়মিত ব্যায়াম, খেলাধুলা এবং আহারগ্রহণে শরীর ভালো থাকে। শরীর সুস্থ থাকলে মন ভালো থাকে। মন ভালো থাকলে পরিবেশকে ভালোলাগে এবং সকল কাজে ধৈর্যের সাথে মনোনিবেশ করা যায়। নিয়মিত পিতা-মাতাকে প্রণাম করলে তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি সুগভীর হয়। মানুষের প্রতি প্রীতি জন্মে। নিয়মিত অধ্যয়ন করলে ভালো ফলাফল করা যায়। জ্ঞানের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ হয় এবং জীবনে সফলতা আসে। নিয়মিত পূজা ও উপাসনা দ্বারা ঈশ্বরের বিভিন্ন শক্তিকে সন্তুষ্ট করা হয়। তাই আমরা গৃহে দেবতার

মূর্তি স্থাপন করে প্রতিদিন পূজা করি। আবার বিশেষ বিশেষ সময়ে বিশেষ বিশেষ দেবতার পূজা করি। এভাবে নিয়মিত পূজা ও উপাসনার ফলে ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি সুগভীর হয় এবং ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করা যায়। আমাদের প্রত্যেকেরই উচিত একটি সুন্দর জীবনযাপনের পথ অনুসন্ধান করা। সুতরাং আমরা নিত্যকর্মের নিয়মাবলি মেনে চলব এবং নিজের কাজে নিষ্ঠাবান থাকব। আমাদের হৃদয়ে থাকবে সুগভীর ঈশ্বরভক্তি।

দলীয় কাজ : * নিত্যকর্ম মেনে চলার পক্ষে পাঁচটি যুক্তি লেখ।
* নিত্যকর্ম মেনে না চললে কী কী অসুবিধা হতে পারে?–তার একটি তালিকা তৈরি কর।

নতুন শব্দ : নিষ্ঠাবান, সমৃদ্ধ, সান্নিধ্য, ধৈর্য, প্রীতি, অধ্যয়ন, অনুসরণ।

পাঠ ৩ : যোগাসনের ধারণা

ঈশ্বরআরাধনার একটি পদ্ধতি হচ্ছে 'যোগ'। সাধারণভাবে 'যোগ' শব্দের অর্থ হচ্ছে কোনোকিছুর সঙ্গে অন্যকিছু যুক্ত করা। ধর্ম অনুশীলনের ক্ষেত্রে এর অর্থ হচ্ছে জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার বা ঈশ্বরের যোগসাধন করা।

'যোগ' শব্দটি সংস্কৃত ভাষা 'যজ্' ধাতু থেকে উৎপন্ন হয়েছে। এর প্রধান অর্থ হলো মিল। যোগক্রিয়া জীবাত্মা পরমাত্মার মিলন ঘটায়। আবার চিত্তনিবৃত্তির এক নাম হলো যোগ। যোগ দর্শনের প্রণেতা মহর্ষি পতঞ্জলি 'যোগ' শব্দের অর্থ করেছেন চিত্তবৃত্তি নিরোধ। সুতরাং যোগ বলতে বোঝায়, চিত্তবৃত্তি নিরোধ করে নিষ্কামভাবে ভগবানের সঙ্গে ও তাঁর সত্য চেতনার সঙ্গে যোগ।

যোগের আটটি অঙ্গ । যথা–

১। যম – যম মানে সংযমী হওয়া।

২। নিয়ম – শরীরের প্রতি যত্ন নেওয়া। নিয়মিত ও পরিমিত স্নান, আহার ও বিশ্রাম করা।

৩। আসন – বিশেষ ভঙ্গিতে বসাকে আসন বলে।

৪। প্রাণায়াম – শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণ করার পদ্ধতিকে প্রাণায়াম বলে।

৫। প্রত্যাহার – মনকে বহির্মুখী হতে না দিয়ে অন্তর্মুখী করাকে প্রত্যাহার বলে।

৬। ধারণা – কোনো এক বিষয়ে মনকে একাগ্র করা।

৭। ধ্যান – কোনো এক বিষয়ে মনের অবিচ্ছিন্ন চিন্তা।

৮। সমাধি – ধ্যানস্থ অবস্থায় মন যখন ইষ্টচিন্তায় সম্পূর্ণভাবে নিমগ্ন থাকে তখন সে- অবস্থাকে বলা হয় সমাধি।

দলীয় কাজ : যোগের অঙ্গগুলো সংজ্ঞাসহ লেখ।

আসন যোগের তৃতীয় অঙ্গ। স্থিরসুখমাসনম্–স্থির ও সুখাবহ অবস্থিতির নামই আসন। সুতরাং যোগ অভ্যাস করার জন্য যেভাবে শরীরকে রাখলে শরীর স্থির থাকে অথচ কোনো কষ্টের কারণ ঘটে না, তাকে যোগাসন বলে।

ঈশ্বর আরাধনার ক্ষেত্রে দেহ এবং মন উভয়েরই গুরুত্ব রয়েছে। দেহকে আশ্রয় করে ধর্ম সাধনা অগ্রসর হয়। তাই দেহকে সুস্থ রাখা সাধনার পূর্বশর্ত। আর যোগাসন হচ্ছে দেহ ও মনকে সুস্থ রাখার একটি প্রক্রিয়া।

সেজন্য প্রাচীনকালে মুনি-ঋষিগণ শরীর ও মনকে সুস্থ রাখার উপায় হিসেবে যোগাসন অনুশীলনের বিধান দিয়ে গেছেন। যোগাসনের সংখ্যা অনেক, যেমন– শবাসন, সিদ্ধাসন, গোমুখাসন, সর্বাঙ্গাসন ইত্যাদি।

একক কাজ : দেহ ও মনের সাথে যোগাসনের সম্পর্ক চিহ্নিত কর।

নতুন শব্দ : জীবাত্মা, পরমাত্মা, যোগক্রিয়া, চিত্তনিবৃত্তি, মহর্ষি, চেতনা, সংযমী, প্রাণায়াম, একাগ্র, অবিচ্ছিন্ন, আরাধনা, বিধান, প্রক্রিয়া, শবাসন, সিদ্ধাসন।

পাঠ ৪ : যোগাসনের সাধারণ নিয়ম ও গুরুত্ব

যোগাসনের সাধারণ নিয়ম :

যোগাসন অনুশীলন করতে হলে অবশ্যই কতগুলো সাধারণ নিয়ম মেনে চলতে হয়। যেমন–

১। নির্দিষ্ট সময় মেনে সকাল ও সন্ধ্যায় যোগাসন অনুশীলন করা ভালো।

২। ভরাপেটে অথবা একেবারে খালিপেটে আসন অভ্যাস করা ঠিক নয়। সামান্য কিছু হালকা খাবার খেয়ে কিছুটা সময় পরে যোগাসন অভ্যাস করতে হবে।

৩। নরম বিছানার ওপর আসন অভ্যাস করা যাবে না। মেঝের উপর কম্বল, শতরঞ্জি বা ঐ জাতীয় কিছু বিছিয়ে আসন অনুশীলন করতে হবে।

৪। যোগাসন কোনো নির্জন স্থানে বা নিভৃত কক্ষে আলো-বাতাসযুক্ত স্থানে করা দরকার, যেন কোনো বাধাবিপত্তি না আসে।

৫। আসন করার সময় আঁটসাঁট ভারী পোশাক না পরে ঢিলেঢালা হালকা পোশাক পরা উচিত।

৬। আসন অভ্যাস করার সময় মনকে ধীর, স্থির, শান্ত ও প্রফুল্ল রাখতে হয়।

৭। আসন অভ্যাসকালে শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক রাখতে হবে।

৮। আসন অবস্থায় মুখে যেন কোনো বিকৃতি ভাব না আসে।

৯। আসন অভ্যাসকালে জোর করে বা ঝাঁকুনি দিয়ে কোনো ভঙ্গিমা বা প্রক্রিয়া করা ঠিক নয়।

১০। নিয়মানুযায়ী প্রত্যেকটি আসন করার পর শবাসনে বিশ্রাম নিতে হবে।

দলীয় কাজ : যোগাসনের নিয়মাবলির একটি তালিকা তৈরি কর।

যোগাসনের গুরুত্ব :

নিয়মিত যোগাসনে দেহে স্থিরতা আসে, দেহ সুস্থ থাকে এবং দেহ লঘুভার হয়। আসন কোনো জিমন্যাস্টিক ব্যায়াম নয়, শুধুই দেহভঙ্গি। এ দেহভঙ্গিতে দেহের প্রতিটি পেশি, স্নায়ু ও গ্রন্থির ব্যায়াম হয়। তাতে দেহ ও মনের কর্মতৎপরতা, সুস্থিতি, সহিষ্ণুতা ও জীবনীশক্তি বৃদ্ধি পায়। আসনে দেহের গঠন সুন্দর ও উজ্জ্বল হয়, দেহ বলশালী ও নমনীয় হয় এবং দেহ রোগমুক্ত থাকে। দেহের রক্তপ্রবাহ বিশুদ্ধ হয়। দেহের মেদ কমাতে, শীর্ণতা দূর করতে যোগাসন কার্যকর ভূমিকা পালন করে। যোগাসন দেহের অবসাদ ও ক্লান্তি দূর করে। যোগাসনে আত্মা ও মন একই কেন্দ্রবিন্দুতে নিবদ্ধ হওয়ার ফলে চিত্তচাঞ্চল্য কমে। আসনের প্রকৃত গুরুত্ব এই যে, আসন মনকে বশে এনে ঊর্ধ্বলোকে নিয়ে যায়। যোগসাধক প্রথমে আসনের মাধ্যমে সুস্বাস্থ্য লাভ করেন তারপর তিনি অধ্যাত্মসাধনায় নিয়োজিত হন। তিনি তাঁর সমস্ত কর্ম ও ফল বিশ্বসেবায় ঈশ্বরে সমর্পণ করেন।

দলীয় কাজ : যোগাসন অনুশীলনের প্রভাব লিখে একটি পোস্টার তৈরি কর।

নতুন শব্দ : নির্জন, নিভৃত, শতরঞ্জি, বিধেয়, প্রফুল্ল, বিকৃতি, লঘুভার, পেশি, স্নায়ু, গ্রন্থি, কর্মতৎপরতা, সুস্থিতি, সহিষ্ণুতা, নমনীয়, শীর্ণতা, অবসাদ, চিত্তচাঞ্চল্য, অধ্যাত্ম, সমর্পণ।

পাঠ ৫ : শবাসনের ধারণা ও অনুশীলন–পদ্ধতি

'শব' শব্দের অর্থ মৃতদেহ। মৃতব্যক্তির মতো নিস্পন্দভাবে শুয়ে যে– আসন করা হয় তার নাম শবাসন। মৃতব্যক্তির যেমন তার দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের উপর কোনো কর্তৃত্ব থাকে না, তেমনি শবাসন অবস্থায় আসনকারীর দেহের কোনো অংশে তার কোনো কর্তৃত্ব থাকবে না।

শবাসনের লক্ষ্য মৃতদেহের মতো নিশ্চল নিঃসাড় হয়ে শুয়ে থাকা, কিন্তু চেতনা হারানো নয়।

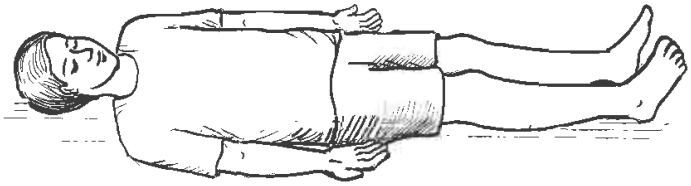

অনুশীলন–পদ্ধতি :

মাটিতে চিৎ হয়ে শুয়ে পা দুটি লম্বা করে দিতে হবে। পা দুটোর মধ্যে প্রায় এক ফুটের মতো ফাঁকা থাকবে এবং হাত দুটোকেও লম্বালম্বিভাবে শরীরের দুপাশে উরু থেকে একটু দূরে রাখতে হবে। হাতের পাতা উপরের দিকে খোলা থাকবে। চোখ বন্ধ, ঘাড় সোজা, গোটা শরীর শিথিল অবস্থায় থাকবে। এবার ধীরে ধীরে চার পাঁচ বার লম্বা শ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করতে হবে। দৈনিক যোগাভ্যাসে কঠিন আসন করার পর বিশ্রামের জন্য এই আসন ৫ থেকে ১০ মিনিট পর্যন্ত করা উচিত। এ ছাড়া আলাদা ভাবে অন্তত ১৫ মিনিট শবাসন করা প্রয়োজন।

একক কাজ : শবাসন অনুশীলন করে দেখাও।

পাঠ ৬ : শবাসনের গুরুত্ব ও প্রভাব

শরীর শিথিলকরণ বা বিশ্রামের জন্য শবাসন যোগসাধনার একটি উপযুক্ত আসন। এতে সম্পূর্ণ শরীর সুস্থবোধ হয়, স্নায়ুমণ্ডলী ও শিরা-উপশিরাগুলো সম্পূর্ণ বিশ্রাম পায়, শরীর ও মনের সমস্ত ক্লান্তি দূর হয়ে যায়। ফলে শরীর, মন, মস্তিষ্ক এবং আত্মার পূর্ণ বিশ্রাম, শক্তি, উৎসাহ ও আনন্দ লাভ হয়।

মানসিক টেনশন, বেশি বা কম রক্তচাপ, হৃদ্‌রোগ, পেটে গ্যাস, ডায়াবেটিস প্রভৃতি রোগ উপশমের ক্ষেত্রে শবাসন উল্লেখযোগ্য অবদান রাখে। আধুনিক যন্ত্রসভ্যতার পীড়নে মানুষের স্নায়ুর উপর প্রচণ্ড চাপ পড়ে, সেই চাপের সর্বোত্তম প্রতিষেধক শবাসন। অনিদ্রার জন্য এই আসন সর্বোত্তম। রাতে ঘুমাতে যাওয়ার পূর্বে ৫-৭ মিনিট বা তার বেশি এই আসন করে আস্তে আস্তে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লে কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুম আসে। শরীর শিথিল করে দিয়ে বিশ্রাম করার এই কৌশল আয়ত্ত হলে ঘুমকেও জয় করা যায়। ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষার সময় আসনটি মানসিক চাপ কমাতে খুবই সহায়তা করে। অত্যধিক পড়াশুনার পর এই আসনে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিলে অবসাদ, ক্লান্তি দূর হয়, নতুন উদ্যম ফিরে আসে, স্মৃতিশক্তিও বৃদ্ধি পায়। সাধকেরা এই আসনের সাহায্যে যোগনিদ্রা আয়ত্ত করে উচ্চস্তরের অনুভূতির রাজ্যে প্রবেশ করতে পারেন। এই আসনে ধ্যানের স্থিতির বিকাশ হয়। যেকোনো আসন অনুশীলনের পর শবাসনে বিশ্রাম নিতে হয়। আমরা যতক্ষণ একটি আসনের ভঙ্গিমায় থাকি তখন যতটা উক্ত আসনের উপকারিতা লাভ করি তার চেয়ে অনেক বেশি উপকৃত হই আসন অভ্যাসের পর শবাসন করে।

দলীয় কাজ : শবাসনের উপকারিতা লিখে একটি পোস্টার তৈরি কর।

নতুন শব্দ : নিশ্চল, নিঃসাড়, শিথিল, উপশম, পীড়ন, প্রতিষেধক, উদ্যম, যোগনিদ্রা

পাঠ ৭ : সিদ্ধাসনের ধারণা ও অনুশীলন পদ্ধতি

সাধনায় সিদ্ধ যোগীদের দ্বারা বিশেষভাবে অনুসৃত হওয়ার ফলে এই আসনের নাম সিদ্ধাসন। এই আসনটি সিদ্ধ যোগীগণ প্রায়ই করতেন বা করেন। এটি দেখতে সাধুদের ধ্যানের মতো। সেজন্য এই আসনকে সিদ্ধাসন বলা হয়।

অনুশীলন পদ্ধতি :

সামনের দিকে পা ছড়িয়ে শিরদাঁড়া বা মেরুদণ্ড সোজা করে বসতে হবে। এবার ডান পা হাঁটু থেকে গোড়ালি দু-পায়ের সংযোগস্থলে স্পর্শ করে রাখতে হবে। তারপর বাঁ পা হাঁটু ভেঙে ডান পায়ের উপর রাখতে হবে। দু-পায়ের গোড়ালি তলপেটের নিচে লেগে থাকবে। এবার হাত দুটো সামনের দিকে ছড়িয়ে দিতে হবে। হাতের তালু উপর দিকে করে ডান হাতের কবজি ডান হাঁটুর উপর আর বাঁ হাতের কবজি বাঁ হাটুর উপর রাখতে হবে। দু-হাতের বুড়ো আঙুল আর তর্জনী ছোঁয়াতে হবে। অন্য আঙুলগুলো সোজা থাকবে। তারপর পিঠ, ঘাড় আর মাথা সোজা রেখে চোখ বন্ধ করে দু-ভ্রূয়ের মাঝে

মনকে একাগ্র করার চেষ্টা করতে হবে। শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক থাকবে। পা বদল করে আসনটি পাঁচ মিনিট করতে হবে। শেষে শবাসনে বিশ্রাম নিতে হবে।

একক কাজ : সিদ্ধাসন অনুশীলন পদ্ধতি ধারাবাহিকভাবে বল এবং বোর্ডে লেখ।

পাঠ ৮ : সিদ্ধাসনের গুরুত্ব ও প্রভাব

সিদ্ধাসনে শরীরের বিশ্রাম হয়। এই আসনে বসে থাকার ফলে শরীর যেমন বিশ্রাম পায়, তেমনি দু-পা আড়াআড়ি আর পিঠ সোজা থাকার ফলে মন স্থির ও তৎপর থাকে। হাঁটু আর গোড়ালির গাঁট শক্ত হয়ে গেলে এই আসনে উপকার পাওয়া যায়। এই আসনে কটিদেশে আর উদরাঞ্চলে ভালো রক্তসঞ্চালন হয় এবং এর ফলে মেরুদণ্ডের নিম্নভাগ আর পেটের ভেতরকার প্রত্যঙ্গগুলো সতেজ ও সবল হয়। কোমর ও হাঁটুর সন্ধিস্থল সবল হয়। এই আসন অভ্যাসে উদরাময়, হৃদরোগ, যক্ষ্মা, ডায়াবেটিস, হাঁপানি প্রভৃতি রোগ দূর হয়। অর্শরোগে এই আসন অত্যন্ত ফলপ্রদ। সিদ্ধাসনে বসে জপ, প্রাণায়াম ও ধ্যানধারণাদি অভ্যাস করলে সহজে ও অল্প সময়ের মধ্যে সিদ্ধিলাভ করা যায়।

দলীয় কাজ : সিদ্ধাসন অনুশীলনের উপকারিতা লিখে একটি পোস্টার তৈরি কর।

নতুন শব্দ : অনুসৃত, সংযোগ, তর্জনী, গাঁট, কটিদেশ, উদরাঞ্চল, সতেজ, সন্ধিস্থল, উদরাময়, অর্শরোগ, ফলপ্রদ, সিদ্ধিলাভ।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ কর :

১. এই পৃথিবীটা বিরাট .....।
২. আমরা গৃহদেবতার ..... স্থাপন করে প্রতিদিন পূজা করি।
৩. দেহকে সুস্থ রাখা ..... পূর্বশর্ত।
৪. যোগাসন অনুশীলনের নির্দিষ্ট ..... থাকা দরকার।
৫. ধ্যান হচ্ছে কোনো এক বিষয়ে ..... অবিচ্ছিন্ন চিন্তা।

ডানপাশ থেকে শব্দ বা বাক্যাংশ এনে বাম পাশের সাথে মিল কর:

বামপাশ	ডানপাশ
১. নিয়মিত ব্যায়াম, খেলাধুলা এবং আহার গ্রহণে	সংযমী হওয়া
২. আসন কোনো জিমন্যাস্টিক	সিদ্ধাসন
৩. যম শব্দের অর্থ	ব্যায়াম নয় শুধু দেহভঙ্গি
৪. সাধুদের ধ্যানের মতো দেখতে	শরীর ভালো থাকে
৫. আয়ুর্বেদে	মনকে একাগ্র করা

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

১. যোগদর্শনের প্রণেতা কে?

ক. বশিষ্ঠ খ. পতঞ্জলি

গ. রামকৃষ্ণ ঘ. বামাক্ষেপা

২. আমরা যোগাসন করি, কারণ—

i. শরীর সুস্থ থাকে

ii. মনে স্থিরতা আসে

iii. জীবাত্মার সাথে পরমাত্মার সংযোগ ঘটে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii

গ. iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

সাগর প্রতিদিন ভোরে ঘুম থেকে উঠে বাইরে এসে পূর্বমুখী হয়ে হাত জোড় করে মন্ত্রপাঠ করে। এরপর নিয়মানুসারে প্রাত্যহিক কাজগুলো সম্পাদন করে।

৩. সাগর প্রতিদিন কোন দেবতাকে প্রণাম জানিয়ে মন্ত্রপাঠ করে?

ক. অগ্নি খ. সূর্য

গ. বায়ু ঘ. ইন্দ্র

৪. সাগরের প্রাত্যহিক কর্মের মধ্যে ফুটে উঠেছে –

i. নিষ্ঠা

ii. ঈশ্বরভক্তি

iii. নিয়মানুবর্তিতা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১. আমরা ধর্মবিশ্বাস করব কেন?

২. হিন্দু শব্দটির কীভাবে উৎপত্তি হয়েছে?

৩. জ্ঞানলাভের উপায়সমূহ লেখ।

৪. দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর।

বর্ণনামূলক প্রশ্ন :

১. 'নিত্যকর্ম করলে নিয়মানুবর্তিতা শেখা যায়'– কথাটি তোমার নিজ কর্ম অনুশীলনের আলোকে লেখ।

২. শবাসন অনুশীলের প্রভাব চিহ্নিত কর।

৩. সিদ্ধাসনের দুটি প্রভাব লেখ।

৪. নিত্যকর্মের প্রভাব ও গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর।

৫. যোগাসন অনুশীলনের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর।

সৃজনশীল প্রশ্ন :

ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রী জয়িতা খুবই চঞ্চলমতি। লেখাপড়ায় মনোযোগ কম। পরীক্ষার সময়কালে রাত জেগে পড়াশুনা করে। এতে সে অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং পরীক্ষার ফলাফলও ভালো হয় না। যোগগুরু হিসেবে পরিচিত জয়িতার মামা বেড়াতে এসে এ অবস্থা দেখে তাকে আসন অনুশীলনের পরামর্শ দেন। জয়িতা এর মাধ্যমে সুস্থ হয়ে ওঠে এবং পড়ালেখায় মনোযোগী হয়।

ক. 'যোগ' শব্দটি কোন ধাতু থেকে উৎপন্ন হয়েছে? ১

খ. যোগাসন বলতে কী বোঝায়? ২

গ. জয়িতা কোন আসন অনুশীলনের মাধ্যমে পড়ালেখায় মনোযোগী হয়েছে? উক্ত আসনটির অনুশীলন–পদ্ধতি ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর জয়িতা উক্ত আসন অনুশীলনে বেশি উপকৃত হবে? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

পঞ্চম অধ্যায়

দেব-দেবী ও পূজা-পার্বণ

ঈশ্বরের সাকার রূপকে দেব-দেবী বলে। যেমন- ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, সরস্বতী, লক্ষ্মী, দুর্গা, কালী ইত্যাদি। এসকল দেব-দেবী ঈশ্বরের বিশেষ গুণ ও ক্ষমতার অধিকারী। এই শক্তি বা গুণ লাভ করার জন্য আমরা এঁদের পূজা করি।

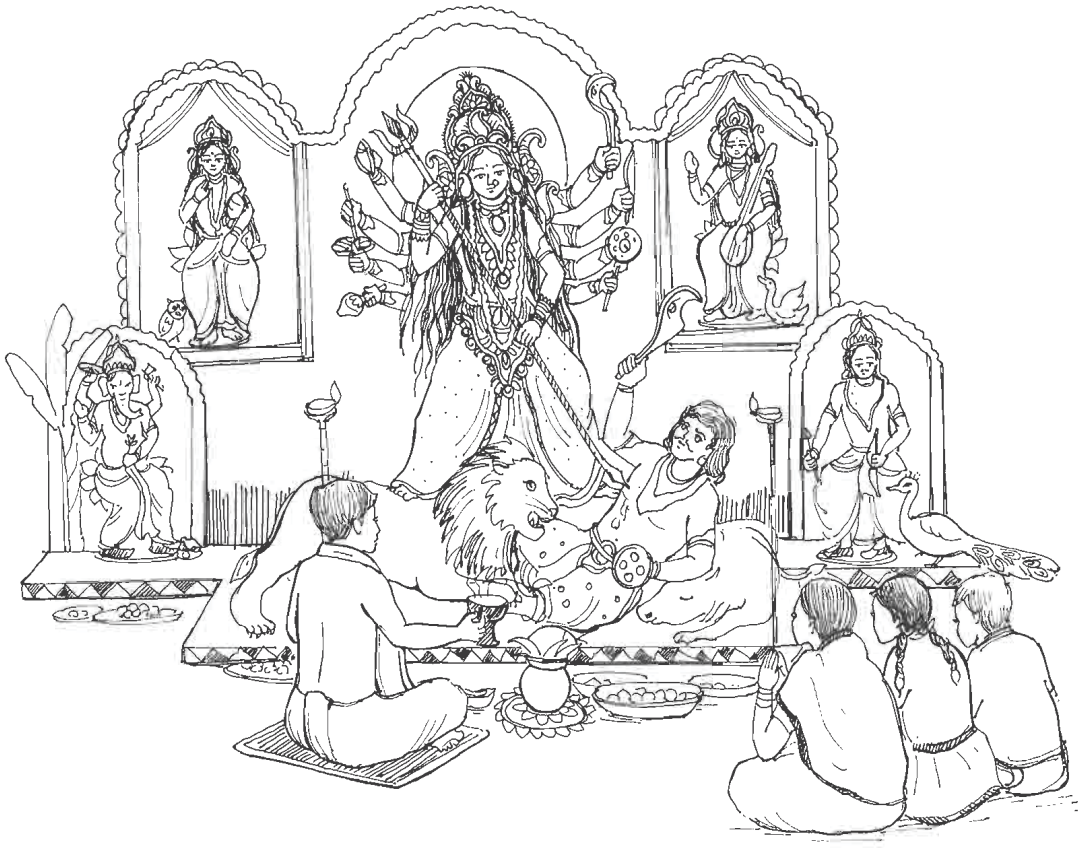

পূজা শব্দের অর্থ প্রশংসা করা বা শ্রদ্ধা করা। কিন্তু হিন্দুধর্মে পূজা শব্দটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়। পূজা বলতে বোঝায় ঈশ্বরের প্রতীক বা তাঁর কোনো রূপকে ফুল ও নানা উপকরণ দিয়ে স্তুতি করা এবং শ্রদ্ধা নিবেদন করা।

পার্বণ শব্দের অর্থ হলো পর্ব বা উৎসব। উৎসব মানে আনন্দ। অর্থাৎ যে- উৎসবগুলো পূজা অনুষ্ঠানকে আনন্দময় করে তোলে, এমন ধরনের অনুষ্ঠানকে পূজা-পার্বণ বলে অভিহিত করে থাকি। এ অধ্যায়ে আমরা দেব-দেবীর ধারণা, পূজা-পার্বণের ধারণা, পূজার গুরুত্ব, গণেশ দেব ও সরস্বতী দেবীর পূজা এবং এঁদের পূজার শিক্ষা ও প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করব।

এ অধ্যায়-শেষে আমরা–

- দেব-দেবী সম্পর্কে ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব
- পূজা-পার্বণের ধারণা ও গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব
- গণেশ দেবের পরিচয় ও পূজাপদ্ধতি বর্ণনা করতে পারব
- গণেশ দেবের প্রণাম ও পুষ্পাঞ্জলি মন্ত্র সরলার্থসহ বলতে ও ব্যাখ্যা করতে পারব
- জীবনাচরণে গণেশ দেবের পূজার শিক্ষা ও প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারব
- সরস্বতী দেবীর পরিচয় পূজাপদ্ধতি বর্ণনা করতে পারব
- সরস্বতী পূজার প্রণাম ও পুষ্পাঞ্জলি মন্ত্র সরলার্থসহ বলতে ও ব্যাখ্যা করতে পারব
- নিজ জীবনে ও সমাজে সরস্বতী পূজার শিক্ষা ও প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারব
- গণেশ ও সরস্বতী পূজায় উদ্বুদ্ধ হব।

পাঠ ১: দেব-দেবীর ধারণা

ঈশ্বরের বিভিন্ন গুণ বা শক্তি যখন আকার পায়, তখন তাঁদের দেব-দেবী বলে। অর্থাৎ দেব-দেবীরা ঈশ্বরের সাকার রূপ। যেমন– ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, দুর্গা, সরস্বতী, লক্ষ্মী, গণেশ প্রভৃতি । এঁরা সকলেই ঈশ্বরের বিশেষ বিশেষ শক্তি বা গুণের অধিকারী। ব্রহ্মা সৃষ্টি করেন, বিষ্ণু প্রতিপালন করেন এবং শিব ধ্বংস করে ভারসাম্য রক্ষা করেন। আবার সরস্বতী বিদ্যার দেবী, গণেশ সফলতার দেবতা। এরকম অনেক দেব-দেবী রয়েছেন।

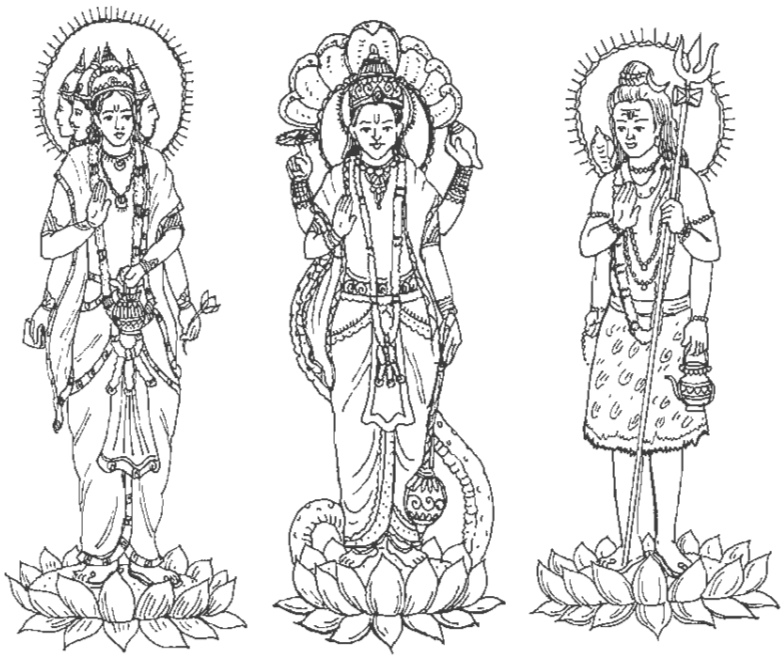

এসকল দেব-দেবীর পূজার মধ্য দিয়ে আমরা তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাই। তাঁদের কাছ থেকে বিশেষ বিশেষ গুণ বা শক্তি প্রার্থনা করি। প্রার্থনায় দেব-দেবীরা সন্তুষ্ট হন। দেব-দেবী আমাদের মঙ্গল করেন।

নতুন শব্দ: প্রতিপালন, ভারসাম্য।

পাঠ ২ : পূজা-পার্বণের ধারণা

পূজা

সাধারণ অর্থে পূজা বলতে প্রশংসা করা বা শ্রদ্ধা নিবেদন করাকে বোঝায়। কিন্তু হিন্দুধর্মে পূজা সাকার উপাসনার পদ্ধতি। এক্ষেত্রে দেব-দেবীদের প্রশংসা বা শ্রদ্ধা করার জন্য তাঁদের সেবা, স্তুতি ও গুণকীর্তন করে প্রণাম করা হয়। নিবেদন করা হয় পুষ্প-পত্র , ধূপ-দীপ, জল, ফল ইত্যাদি নৈবেদ্য। জীবের মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করা হয়। একত্রে এ বিষয়গুলোকে পূজা বলে।

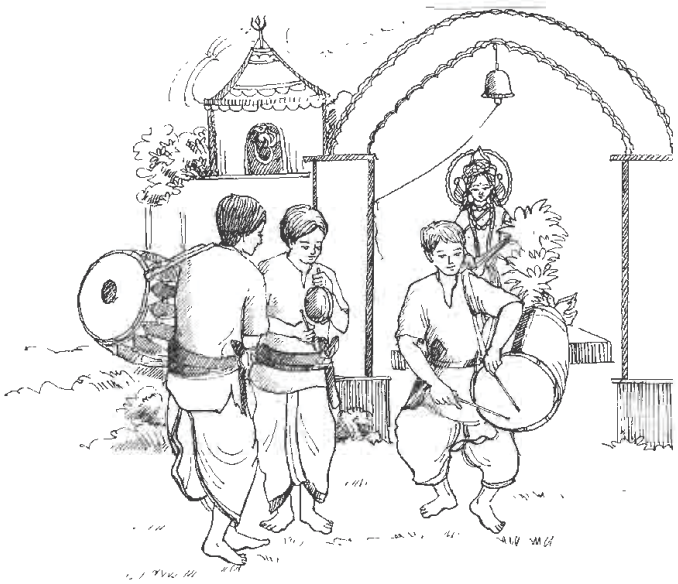

পূজার আচরণগত দিক বলতে পূজা করার রীতি-নীতিকে বোঝানো হয়। অর্থাৎ পূজা কীভাবে করতে হবে, কীভাবে প্রতিমা নির্মাণ করতে হবে, কীভাবে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে হবে, কী কী উপচারের প্রয়োজন হবে ইত্যাদি বিষয় পূজার আচরণগত দিকের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। দেশ ও অঞ্চলভেদে পূজাপদ্ধতির ভিন্নতা রয়েছে। তবে পূজা করার মৌলিক দিকগুলোর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। আবাহন, অর্ঘ প্রদান, ধ্যান, পূজামন্ত্র, পুষ্পাঞ্জলি, প্রার্থনামন্ত্র, প্রণামমন্ত্র ইত্যাদি পূজার বিভিন্ন অঙ্গ। আমরা প্রতিদিন পূজা করি। আবার প্রতি সপ্তাহ, প্রতি মাস বা বছরের বিশেষ বিশেষ সময়েও বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজার আয়োজন করে থাকি। দেব-দেবী অনুসারে পূজা পদ্ধতি ও মন্ত্র ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। তবে যে-কোনো দেব-দেবীর পূজা করার ক্ষেত্রে কতগুলো সাধারণ নিয়ম-নীতি অনুসরণ করতে হয়। এই নিয়ম-নীতিগুলোকে সাধারণভাবে পূজাবিধি বলে।

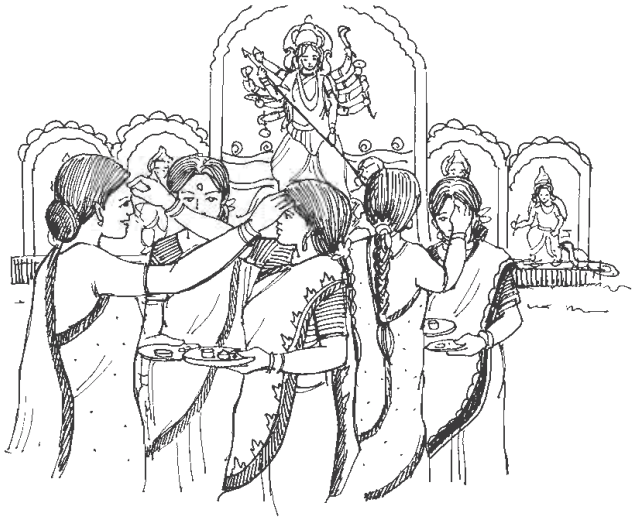

পার্বণ

পার্বণ শব্দের অর্থ হলো পর্ব বা উৎসব। উৎসব মানে আনন্দময় অনুষ্ঠান। পূজা-পার্বণ বলতে আমরা বুঝি, যেসব পর্ব পূজা অনুষ্ঠানকে আনন্দময় করে তোলে। যেমন– প্রতিমা নির্মাণ, দেবতার ঘর সাজানো, বিভিন্ন ধরনের বাদ্যের আয়োজন, বিশেষ করে ঢাক, ঢোল, ঘণ্টা, করতাল, কাঁসি, শঙ্খ ইত্যাদি ; ভক্তদের সাথে ভাববিনিময়, কিছুটা বিচিত্রধর্মী খাওয়াদাওয়া, বিভিন্ন ধরনের আনন্দমূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন, পরিচ্ছন্ন পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান ইত্যাদি।

একক কাজ :
* দেব-দেবী বলতে কী বোঝায়?
* পূজা বলতে কী বোঝায়? পূজার সময় কী কী অনুষ্ঠান করা হয়?
* পার্বণ বলতে কী বোঝায়? কয়েকটি পার্বণের নাম লেখ।

নতুন শব্দ : নৈবদ্য, উপাচার, অর্ঘ, পুষ্পাঞ্জলি, পার্বণ।

পাঠ ৩ : দেব-দেবীর পূজার গুরুত্ব

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজবদ্ধভাবে বাস করাই মানুষের প্রকৃতি। ধর্ম সমাজকে সুসংগঠিত করে গড়ে তোলে। আধ্যাত্মিক ও আর্থ-সামাজিক দিক থেকে পূজা-পার্বণ যথেষ্ট গুরুত্ব বহন করে। পূজা-পার্বণের মাধ্যমে সামাজিক মিলনের সৃষ্টি হয় । সকলে মিলে যখন পূজা করা হয় তখন পূজা হয়ে ওঠে পার্বণ বা উৎসবমুখর।

প্রতিমা আনয়ন, পূজার উপকরণ সংগ্রহ, মন্দিরে পূজার সাজসজ্জা, ধূপের গন্ধ, আরতি, প্রসাদ বিতরণ, নতুন পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান প্রভৃতি আমাদের মনে সুন্দর ও পবিত্র পরিবেশের সৃষ্টি করে। এর ফলে আমাদের মনে শুভ্রতা সৃষ্টি করে এবং ভ্রাতৃত্ব ও সৌহার্দ্যের ভাব জাগ্রত হয়।

পূজা আমাদের আত্মাকে পবিত্র করে, মনকে সুন্দর করে এবং অভীষ্ট দেবতার প্রতি একাগ্রতা ও ভক্তি জাগ্রত করে। পূজা উপলক্ষে বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। যেমন– ধর্মীয় আলোচনা সভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, মেলা ইত্যাদি। অনেকে স্মরণিকাও প্রকাশ করে থাকেন। পূজা-পার্বণ উপলক্ষে এসব আয়োজন আমাদের সাংস্কৃতিক চেতনার বিকাশ ঘটায়।

পূজা পার্বণে সামাজিক ও পারিবারিক পর্যায়ে উন্নত খাবারদাবারের অয়োজন করা হয় এবং ঋতুভিত্তিক বিভিন্ন ধরনের ফল খাওয়া হয়। ফলে পরিবারিক পুষ্টি সমস্যা সমাধানে পূজা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। বিভিন্ন পূজায় বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিদের অংশবিশেষ প্রয়োজন হয় যা পূজা-উপকরণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ফলে শিশুরা শৈশব থেকেই বিভিন্ন ধরনের গাছপালার সাথে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পায় এবং উদ্ভিদের গুণাগুণ সর্ম্পকে অবহিত হয়।

নতুন শব্দ : আধ্যাত্মিক, উৎসবমুখর, সৌহার্দ্য, স্মরণিকা।

পাঠ ৪ : গণেশ দেব

গণেশ দেবের পরিচয়

গণেশ দেব সিদ্ধি বা সফলতার দেবতা। গণেশ দেব গণপতি, গজানন, হেরম্ব, বিনায়ক প্রভৃতি নামেও পরিচিত। গণেশের শরীর মানুষের মতো। তার ওপর গজ বা হাতির মাথা বসানো। এজন্য গণেশকে গজানন বলা হয়। তাঁর চার হাত, তিন চোখ। লম্বা তাঁর উদর, স্থূল বা মোটা তাঁর শরীর। তিনি একটু বেঁটে। গণেশদেবের বাহন ইঁদুর।

দেবতা হিসেবে গণেশ সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। তিনি সকল বাধাবিপত্তি দূর করে মানুষের সকল প্রচেষ্টায় সফলতা দান করেন। এ কারণে যে-কোনো কাজ আরম্ভ করার পূর্বে দেবতা গণেশের পূজা করা হয়। হিন্দুধর্মাবলম্বীরা নববর্ষে

এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সিদ্ধিদাতা হিসেবে গণেশের পূজা করেন।

ধর্মগ্রন্থে গণেশ দেবের জ্ঞান ও বীরত্বের অনেক কাহিনী রয়েছে।

গণেশ দেবের পূজা

দুর্গাপূজা ও বাসন্তীপূজার সময় এবং ভাদ্র ও মাঘ মাসের শুক্লপক্ষের চতুর্থ তিথিতে বিশেষভাবে গণেশ দেবের পূজা করা হয়। এ ছাড়া যে-কোনো পূজা করার আগে গণেশ দেবের পূজা করার রীতি রয়েছে। পূজা যথাযথভাবে সমাপ্ত করার জন্য পূজার উপকরণ সংগ্রহ করতে হয়। পূজা করার বিধিসমূহ অনুসরণ করতে হয়। গণেশ দেবের পূজায় তুলসীপত্র নিষিদ্ধ।

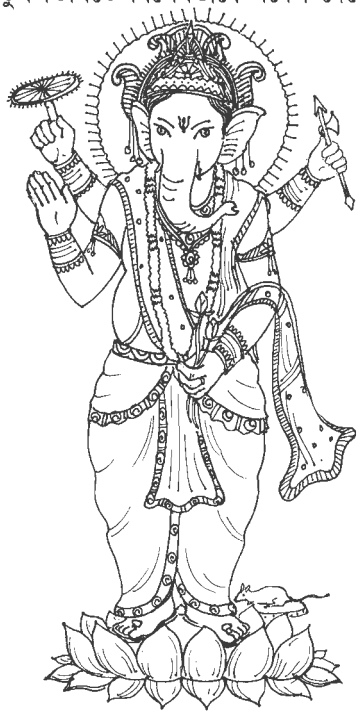

গণেশ দেবের প্রণাম মন্ত্র

একদন্তং মহাকায়ং লম্বোদরং গজাননম্।
বিঘ্ননাশকরং দেবং হেরম্বং প্রণামাম্যহম্ ॥

সরলার্থ : যিনি এক-দাঁত-বিশিষ্ট, যাঁর শরীর বিশাল, লম্বা উদর, যিনি গজানন এবং বিঘ্ননাশকারী, সেই হেরম্বদেব গণেশকে প্রণাম জানাই।

গণেশ দেবের পূজার শিক্ষা ও প্রভাব

গণেশ দেব সকল কাজের সফলতার দেবতা। সুতরাং গণেশ পূজার মুখ্য উদ্দেশ্য হলো সকল কাজের বাধাসমূহ দূর করে সফলতা লাভ।

যে-কোনো কাজ আরম্ভ করার সময় আমরা গণেশ দেবকে স্মরণ করব এবং বিধিমতো তাঁর পূজা করব।

নতুন শব্দ : সিদ্ধিদাতা, মহাকায়, লম্বোদরং, গজানন, হেরম্ব, বিঘ্ন।

পাঠ ৫ : সরস্বতী দেবী

পরিচয় ও পূজাপদ্ধতি

সরস্বতী দেবী বিদ্যা, সংস্কৃতি ও শিল্পকলার দেবী। বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের কারণে সরস্বতী বাগ্‌দেবী, বিরজা, সারদা, ব্রাহ্মী, শতরূপা, মহাশ্বেতা প্রভৃতি নামেও পরিচিত। সরস্বতীর বর্ণ চন্দ্রের কিরণের মতো শুভ্র। তাঁর হাতে আছে বীণা ও পুস্তক। রাজহংস তাঁর বাহন ।

মাঘ মাসের শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে দেবী সরস্বতীর পূজা করা হয়। দেবী সরস্বতী শুভ্র বসন পরিহিতা। সাদা পদ্ম ফুল তাঁর আসন। সাধারণত মাঘ মাসের শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে সরস্বতী দেবীর পূজার আয়োজন করা হয়। সরস্বতী পূজা পারিবারিক এবং সামাজিকভাবে করা যায়। স্কুল-কলেজ বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেও সাড়ম্বরে সরস্বতী দেবীর পূজা করা হয়। সাকার রূপে প্রতিমার মাধ্যমে সরস্বতী দেবীর পূজা করা হয়। পূজার পদ্ধতি হিসেবে পূজার মণ্ডপ সাজানো, উপকরণ সংগ্রহ, সংকল্প গ্রহণ, আমন্ত্রণ জানানো বা প্রাণপ্রতিষ্ঠা, বসার আসন বা সিংহাসন সমর্পণ, পা ধোয়ার জন্য জল সমর্পণ, হাত ধোয়ার জল সমর্পণ, আচমন বা অভ্যন্তরীণ অঙ্গপ্রতঙ্গ শুদ্ধকরণ প্রভৃতি সাধারণ পূজাবিধি অনুসারে সম্পাদন করা হয়। সরস্বতী দেবীর পুষ্পাঞ্জলির জন্য লাল রঙের ফুলের প্রয়োজন হয়। পলাশ ফুল সরস্বতী দেবীর প্রিয় ফুল।

সরস্বতী দেবীর পুষ্পাঞ্জলি মন্ত্র :

ওঁ সরস্বত্যৈ নমো নিত্যং
ভদ্রকাল্যৈ নমো নমঃ।
বেদ-বেদাঙ্গ-বেদান্ত-
বিদ্যাস্থানেভ্যঃ এব চ।।
এষ সচন্দন-বিল্বপত্র-পুষ্পাঞ্জলিঃ ঐং শ্রীশ্রীসরস্বত্যৈ নমঃ

সরলার্থ : দেবী সরস্বতী, ভদ্রকালীকে নিত্য প্রণাম করি। প্রণাম জানাই বেদ, বেদাঙ্গ, বেদান্ত ইত্যাদি বিদ্যাস্থানকে এবং এ- স্থানকে সর্বদা প্রণাম করি। এই চন্দনযুক্ত বিল্বপত্র ও পুষ্পের অঞ্জলি দিয়ে শ্রী শ্রী সরস্বতী দেবীকে প্রণাম জানাই।

প্রণাম মন্ত্র

ওঁ সরস্বতী মহাভাগে বিদ্যে কমললোচনে।
বিশ্বরূপে বিশালাক্ষি বিদ্যাং দেহি নমোহস্তুতে।

সরলার্থ : হে মহীয়সী বিদ্যাদেবী সরস্বতী, পদ্মফুলের মতো তোমার চক্ষু, তুমি বিশ্বরূপা। হে বিশাল চক্ষুধারণকারী দেবী, তুমি বিদ্যাদান কর। তোমাকে প্রণাম করি।

নতুন শব্দ : বেদান্ত, বেদাঙ্গ, বিশালাক্ষি, কমললোচন, মহাশ্বেতা, ব্রাহ্মী।

পাঠ ৬ : সরস্বতী দেবীর পূজার শিক্ষা ও প্রভাব

সরস্বতী বিদ্যার দেবী। হিন্দুধর্মাবলম্বীরা নিজেদের মনের অজ্ঞতা দূর করা এবং জ্ঞানের বিকাশের জন্য বিদ্যাদেবী সরস্বতীর পূজা করে। এর মধ্য দিয়ে জ্ঞান আহরণের আগ্রহ বেড়ে যায়। সামাজিক দিক থেকে সরস্বতী পূজার গুরুত্ব রয়েছে। স্কুল-কলেজের হিন্দুধর্মাবলম্বী ছাত্রছাত্রীরা এ দিনটি গভীর ভক্তিভরে উদ্‌যাপন করে থাকে। বিদ্যাদেবী সরস্বতীর কাছে বিনীতভাবে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করে এবং প্রতিবছর নিজকে পরিশ্রুত করে যা জ্ঞান আহরণের মাত্রাকে

সামাজিক প্রেক্ষাপটে সরস্বতী পূজার মাধ্যমে সমাজের সকল শ্রেণির পূজারিরা বিভিন্ন পূজামণ্ডপে পুষ্পাঞ্জলি দেওয়ার জন্য একত্রিত হয় এবং নিজেদের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনায় অংশগ্রহণ করে যা জ্ঞানের বিকাশে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। অপরদিকে নিজেদের মধ্যে কুশল-বিনিময় করে এবং এর মাধ্যমে ব্যক্তি ও পরিবারিক পর্যায়ে সম্পর্কের গভীরতা বৃদ্ধি পায় আর এ সুসম্পর্ক সমাজকে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিতে সহায়তা করে।

আধ্যাত্মিক দিক থেকে সরস্বতী পূজার মাধ্যমে পূজারিদের মধ্যে বিদ্যা অর্জনের একাগ্রতা ও মনোবল অনেকটা বৃদ্ধি পায় এবং তা একজন পূজারির নৈতিকতাকে যেমন সমৃদ্ধিশালী করে তেমনি ভবিষ্যতের স্বপ্ন অর্জনের শক্তি যোগায়।

একক কাজ :
* সরস্বতী কিসের দেবী হিসেবে পরিচিত ?
* তাঁর বাহন কী ?
* আমরা সরস্বতী দেবীর পূজা করব কেন ?
* সরস্বতী পূজা কোন সময় করতে হয় ?
* সরস্বতী পূজার পুষ্পাঞ্জলি মন্ত্রটির সরলার্থ লেখ।

নতুন শব্দ : বিকাশ, সমৃদ্ধ শালী, কুশল, মনোবল।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ কর :

১. দেবতারা ঈশ্বরের ..... রূপ।
২. সরস্বতী ..... দেবী।
৩. সকলে মিলে পূজা করলে পূজা হয়ে ওঠে .....।
৪. পূজা পার্বণে ..... পবিত্র হয়।

ডানপাশ থেকে শব্দ বা বাক্যাংশ এনে বাম পাশের সাথে মিল কর :

বামপাশ	ডানপাশ
১. বিষ্ণু	তুলসী পাতা নিষিদ্ধ
২. সরস্বতী	লাল ফুলের প্রয়োজন হয়
৩. গণেশ পূজায়	সফলতার দেবতা
৪. সরস্বতী দেবীর পূজায়	আমাদের প্রতিপালন করেন
৫. গণেশ	অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার প্রেরণা দেয়
	বিদ্যাদান করেন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:

১. দেবতা গণেশের বাহন কী?

ক. হাতি খ. ঘোড়া
গ. মহিষ ঘ. ইঁদুর

২. পূজার মাধ্যমে মানুষের মনে জাগ্রত হয়–

i. ভ্রাতৃত্ববোধ
ii. অন্তরের পবিত্রতা
iii. বিলাসী জীবনযাপন

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii
গ. i ও ii ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

ষষ্ঠ শ্রেণির শিক্ষার্থী সৌরভ বিদ্যার্জন ও জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্যে সকাল থেকে উপবাস করে পুষ্পাঞ্জলি প্রদানের মাধ্যমে দেবীকে প্রণতি জানায়।

৩. সৌরভ কোন দেবীকে প্রণতি জানিয়েছে?

ক. লক্ষ্মী খ. সরস্বতী
গ. দুর্গা ঘ. মনসা

৪. উক্ত পূজার শিক্ষা থেকে সৌরভ যে নৈতিক জ্ঞান অর্জন করবে তা হলো–

ক. সামাজিক সম্প্রীতি সামাজিক বন্ধনের পূর্বশর্ত
খ. বিদ্যার্জন ব্যক্তিজীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ
গ. সমৃদ্ধি অর্জনই উন্নতির সোপান
ঘ. আসুরিক শক্তির বিনাশই শান্তি লাভের উপায়

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১. পূজার মৌলিক উপাদানগুলো কী?
২. ধ্যান ও পূজার ধারণা উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর।
৩. আমরা গণেশ পূজার শিক্ষা কোন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করব?

বর্ণনামূলক প্রশ্ন :

১. পূজার সামাজিক ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব চিহ্নিত কর।

২. গণেশ পূজা থেকে আমরা কী শিক্ষা লাভ করে থাকি? –এ শিক্ষার প্রয়োগ চিহ্নিত কর।

৩. সরস্বতী পূজার আধ্যাত্মিক ও সামাজিক প্রভাব চিহ্নিত কর।

সৃজনশীল প্রশ্ন :

দীপ্ত বিদ্যায় সাফল্য অর্জনের জন্য প্রতিবছর প্রতিমা নির্মাণ করে বিশেষ ঘটা করে বাড়িতে সরস্বতী পূজা করে। এ পূজায় বহুলোকের সমাগম ঘটে। আবার দীপ্তর বাবা ব্যবসায়ের সাফল্য কামনা করে প্রতিদিন সকালে দেবতার উদ্দেশে ধূপ জ্বালিয়ে প্রার্থনা করেন। তা ছাড়া তিনি সকল বাধাবিঘ্ন দূর করার উদ্দেশ্যে বছরের নির্ধারিত দিনে বিশেষভাবে এ পূজা করে থাকেন। এ পূজাতেও সমাজের বিভিন্ন লোকের সমাগম ঘটে। দীপ্ত ও তার বাবা উভয়েই নিজ নিজ উদ্দেশ্য অর্জনে ভক্তিসহকারে পূজা সম্পন্ন করে তৃপ্ত হয় এবং পূজা উপলক্ষে তাদের বাড়িটি একটি সামাজিক মিলনমেলায় পরিণত হয়।

ক. পূজা শব্দের অর্থ কী? ১

খ. আমরা পূজা করি কেন ব্যাখ্যা কর। ২

গ. দীপ্তর বাবা ব্যবসায়ে সাফল্য অর্জনের উদ্দেশ্যে কোন দেবতার পূজা করেন? উক্ত পূজার পদ্ধতি বর্ণনা কর। ৩

ঘ. দীপ্ত এবং তার বাবার নিবেদনকৃত দেব-দেবীর পূজার আধ্যাত্মিক ও সামাজিক প্রভাবের তুলনা কর। ৪

ষষ্ঠ অধ্যায়

ধর্মীয় উপাখ্যানে নৈতিক শিক্ষা

'নীতি' শব্দ থেকে 'নৈতিক' শব্দের উৎপত্তি। যে-শিক্ষা দ্বারা মানুষের মনে নীতিবোধ জন্মে, কিছু আচার ও নিয়মকানুন আয়ত্ত হয়, তাকে 'নৈতিক শিক্ষা' বলা হয়। 'নৈতিক শিক্ষা' ধর্মের অঙ্গ। মানবিক মূল্যবোধ সৃষ্টির জন্য নৈতিক শিক্ষার ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। হিন্দুধর্মগ্রন্থসমূহে তাত্ত্বিক আলোচনার পাশাপাশি দৃষ্টান্তমূলক উপাখ্যানের মধ্য দিয়েও নৈতিক শিক্ষা প্রদান করা হয়েছে। এ অধ্যায়ে সত্যবাদিতা, ক্ষমা, জীবসেবা প্রভৃতি নৈতিক শিক্ষার ধারণা, গুরুত্ব এবং ধর্মগ্রন্থ থেকে তার দৃষ্টান্তমূলক উপাখ্যান সন্নিবেশিত হয়েছে।

এ অধ্যায়ের শেষে আমরা–

- ধর্মীয় উপাখ্যান ও নৈতিক শিক্ষার সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারব
- সত্যবাদিতা, ক্ষমা, জীবসেবা, কর্তব্যনিষ্ঠা ও ভ্রাতৃপ্রেম-এর ধারণা ব্যাখ্যা করতে ও তৎসম্পর্কিত উপাখ্যান বর্ণনা করতে পারব
- উপাখ্যানের শিক্ষা মূল্যায়ন করতে পারব
- সত্যবাদিতা, ক্ষমা, জীবসেবা, কর্তব্যনিষ্ঠা ও ভ্রাতৃপ্রেমের গুরুত্ব উপলব্ধি করে ব্যক্তি ও সমাজজীবনে তার অনুশীলনে উদ্বুদ্ধ হব।

পাঠ ১ : ধর্মীয় উপাখ্যান ও নৈতিক শিক্ষা

ধর্মগ্রন্থের মধ্য দিয়ে আমরা সৎ জীবনযাপনের নৈতিক আদর্শ সম্পর্কে শিক্ষা লাভ করতে পারি। হিন্দুধর্মগ্রন্থসমূহে এ নৈতিক শিক্ষা দুভাবে দেয়া হয়েছে :

এক. সরাসরি নৈতিক শিক্ষা। যেমন– সত্য কী, সত্যবাদিতার উপকারিতা কী ইত্যাদি।

দুই. ধর্মীয় উপাখ্যানের মাধ্যমে। হিন্দুধর্মগ্রন্থসমূহে এমন প্রাসঙ্গিক উপাখ্যান সংযোজন করা হয়েছে যার মধ্য

দিয়ে নৈতিক শিক্ষা প্রতিফলিত হয়েছে। যেমন– সত্যবাদিতা সম্পর্কে সত্যকামের উপাখ্যান।

এর উদ্দেশ্য হলো, শিক্ষাকে আনন্দময় করে তোলা। কারণ আমরা জানি, গল্প বা উপাখ্যান আমাদের যতটা আকর্ষণ করে তাত্ত্বিক বর্ণনা ততটা করে না।

এসো আমরা সত্যবাদিতা, ক্ষমা, জীবসেবা, কর্তব্যনিষ্ঠা ও ভ্রাতৃপ্রেম এ নৈতিক মূল্যবোধগুলোর ধারণা লাভ করি এবং এগুলোর প্রতিফলনমূলক ধর্মীয় উপাখ্যান শুনি।

পাঠ ২ : সত্যবাদিতা

সত্যবাদিতার ধারণা

সত্যবাদিতা একটি বিশেষ গুণ। এ গুণ যার থাকে, তিনি সমাজে বিশেষ ভাবে সম্মানিত হন। সত্যবাদিতা মানব-চরিত্রের একটি মহৎ গুণ। গোপন না করে অকপটে সবকিছু প্রকাশ করার নামই 'সত্যবাদিতা'। সত্য মানবজীবনের স্বরূপ বিকশিত করে। সত্যের মাধ্যমে প্রকৃত ঘটনা বা তথ্য সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়। সত্যবাদী কখনও খারাপ কাজ করতে পারে না। সত্যবাদীকে সকলে ভালোবাসে, সম্মান করে, শ্রদ্ধা করে। সত্যবাদিতা ধর্মের অঙ্গ। সকলেরই উচিত সত্যকথা বলা, সৎ পথে চলা এবং সত্যবাদিতার অনুশীলন করা। এ বিশ্বে যত মহাপুরুষ আছেন তাঁরা সকলেই সত্যবাদী। সত্য প্রকাশ করাই ছিল তাদের জীবনের অন্যতম ব্রত।

একক কাজ : কোন গুণদ্বারা তুমি সত্যবাদী লোককে চিহ্নিত করবে দৃষ্টান্তসহ লেখ

সত্যবাদিতা সম্পর্কে উপনিষদ থেকে একটি উপাখ্যান বর্ণনা করছি।

উপাখ্যান : সত্যবাদী সত্যকাম

প্রাচীনকালে গৌতম নামে এক ঋষি ছিলেন। একদিন তিনি তাঁর আশ্রমে শিষ্যদের নিয়ে ব্রহ্মবিদ্যা বিষয়ে আলোচনা করছিলেন। এমন সময় একটি বালক এসে তাঁকে প্রণাম করে মাথা নিচু করে তাঁর সম্মুখে দাঁড়াল। ঋষি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কে? কোথা থেকে এসেছ?'

বালকটি উত্তর করল, 'আমার নাম সত্যকাম। এখান থেকে এটকু দূরে গ্রামে আমার বাড়ি। সেখান থেকেই এসেছি।'

ঋষি বললেন, 'এখানে কী চাও?' বালকটি বিনীত ভাবে উত্তর দিল, 'গুরুদেব, আমি আপনার নিকট ব্রহ্মচর্য পালন করে ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা করতে চাই।'

তখন ঋষি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার গোত্র কী?' বালকটি করজোড়ে বলল, 'গুরুদেব, আমি আমার গোত্র কী তা জানি না। বাড়িতে আমার মা আছেন। আমি মাকে জিজ্ঞাসা করে কাল আপনাকে বলব।' গৃহে এসে মাকে সব কথা খুলে বলল সত্যকাম। তার মা তাকে বলল, 'বাবা সত্যকাম আমি তোমার গোত্র কী তা জানি না। আমার নাম জবালা। তাই তুমি জাবাল সত্যকাম।'

পরের দিন সত্যকাম ঋষির আশ্রমে গিয়ে গুরুদেবকে প্রণাম করে বলল, 'গুরুদেব, আমি মাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম আমার গোত্র কী। কিন্তু মা বললেন যে তিনিও জানেন না আমার গোত্র কী। আমার মায়ের নাম জবালা। তাই আমি জাবাল সত্যকাম।'

সত্যকামের মুখে এমন সরল সত্যকথা শুনে ঋষি তাকে বুকে টেনে নিয়ে আলিঙ্গন করে বললেন, 'বৎস সত্যকাম, তুমি সত্যকথা বলেছ। সুতরাং তুমি ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণই এমন সত্য কথা বলতে পারে। আমি তোমাকে উপনয়ন দেব, ব্রহ্মবিদ্যা দান করব।' গোত্রহীন হয়েও সত্যকাম সত্যকথা বলেছে বলে ঋষি তাকে তাড়িয়ে না দিয়ে তাকে বুকে টেনে নিলেন। ব্রহ্মচর্য পালন করতে অনুমতি দিলেন। সেদিন থেকে সত্যকাম ঋষি গৌতমের আশ্রমে থেকে বিদ্যাচর্চা আরম্ভ করল।

উপাখ্যানের শিক্ষা

সত্যবাদিতার জয় অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং সকলেরই সত্যবাদী হওয়া উচিত। আমরাও সত্যকথা বলব, সত্যবাদী হব।

একক কাজ : সত্যবাদী সত্যকাম উপাখ্যানের শিক্ষা উল্লেখ কর এবং তোমার জীবনে এ শিক্ষার ক্ষেত্র চিহ্নিত কর।

নতুন শব্দ : গোত্র, ব্রহ্মচর্য, ব্রহ্মবিদ্যা।

পাঠ ৩ : ক্ষমা

ক্ষমার ধারণা

ক্ষমা একটি মহৎ গুণ। ক্ষমা ধর্মের অঙ্গ। শাস্ত্রে আছে–

ধৃতি-ক্ষমা-দমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্মলক্ষণম্।।

অর্থাৎ সহিষ্ণুতা, ক্ষমা, দয়া, চুরি না করা, শুচিতা, ইন্দ্রিয়-সংযম, শুভবুদ্ধি, জ্ঞান, সত্য ও অক্রোধ– এই দশটি ধর্মের স্বরূপ বা বাহ্য লক্ষণ। এখানে এই দশটি লক্ষণের মধ্যে দ্বিতীয় যে গুণ বা লক্ষণ– সেটি হলো ক্ষমা। আমরা জানি ধর্মের পরিচয় পাওয়া যায় ধার্মিকের মধ্যে। সুতরাং যিনি ধার্মিক তাঁর মধ্যে ক্ষমা নামক গুণটি থাকতেই হবে।

অনুতপ্ত অপরাধীকে শাস্তি না দিয়ে ছেড়ে দেওয়াকে 'ক্ষমা' বলে। শাস্তি দেওয়ার মতো শক্তি সাহস এবং ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও অপরাধী বা অন্যায়কারীর উপর প্রতিশোধ না নিয়ে বা বল প্রয়োগ করে তাকে পরাভূত বা পর্যুদস্ত না করে, তাকে ছেড়ে দেওয়াকেই ক্ষমা করা বলে। 'ক্ষমা' দ্বারা আপরাধীর মনে অনুশোচনা হয়। এতে তার আত্মশুদ্ধির সুযোগ ঘটে। ভবিষ্যতে অন্যায়কারী বা অপরাধী আর কোনো অন্যায়-অপরাধ করা থেকে বিরত থাকে। কারণ তার বিবেক এসব খারাপ কাজ করা থেকে তাকে নিবৃত্ত করবে। 'ক্ষমা' দ্বারা শত্রুকে তার শত্রুতা থেকে নিবৃত্ত করা সম্ভব। আর এভাবেই সমাজ থেকে অশান্তি দূর হতে পারে। পৃথিবীতে যত মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেছেন তাঁরা সকলেই এই 'ক্ষমা' গুণের অধিকারী ছিলেন। এই ক্ষমা গুণই তাঁদেরকে মহান বলে সকলের নিকট পরিচিত করেছে। তাঁদের দ্বারাই সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আমরা ক্ষমাশীল হব। তাহলে আমাদের ব্যক্তিজীবন ও সমাজ শৃঙ্খলামণ্ডিত থাকবে।

একক কাজ : ধর্মের দশটি বাহ্যিক লক্ষণের নাম লেখ।

ক্ষমার আদর্শবিষয়ক একটি উপাখ্যান–

উপাখ্যান : ক্ষমার আদর্শ

প্রায় পাঁচশত বছর আগের কথা। সে-সময় জাতিভেদ, বর্ণভেদ সমাজকে কলুষিত করেছিল। সমাজের এই ভেদাভেদ দূর করে সমাজকে কলুষমুক্ত করতে, ধর্মীয় গোঁড়ামি ভেঙে দিতে ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান সহজ করে দিলেন শ্রীগৌরাঙ্গ। এই শ্রীগৌরাঙ্গ বা শ্রীগৌরসুন্দরই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু। তাঁর সহচর ছিলেন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু। আরও ছিলেন– শ্রীঅদ্বৈত আচার্য, শ্রীহরিদাস, শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন, শ্রীজীব, শ্রীগোপাল ভট্ট, শ্রীরঘুনাথ দাস প্রমুখ।

শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু তাঁদের বললেন, কৃষ্ণনাম কর। জাতিধর্ম নির্বিশেষে হরিনাম বিলাও, শ্রীনিত্যানন্দ মেতে উঠলেন কৃষ্ণনাম সংকীর্তনে। যাকে পান, তাকেই বলেন কৃষ্ণনামের কথা, ভজনের কথা।

সে-সময় নবদ্বীপে জগাই মাধাই নামে দুই ভাই বাস করত। তারা ব্রাহ্মণসন্তান হয়েও সব সময় পাপকাজে মত্ত ছিল। মদ খেয়ে মাতাল হয়ে মানুষের প্রতি অত্যাচার করাই ছিল তাদের দৈনন্দিন কাজ। তাদের অত্যচারে নবদ্বীপের লোক অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। জগাই-মাধাইয়ের এমন দুরবস্থা দেখে নিত্যানন্দের প্রাণ কেঁদে উঠল। করুণায় তাঁর মন গলে গেল। তিনি তাঁর সঙ্গী সাথিদের নিয়ে জগাই মাধাইয়ের বাড়ির কাছে গিয়ে কীর্তন শুরু করলেন–

বল কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ কহ কৃষ্ণ নাম।
কৃষ্ণ মাতা কৃষ্ণ পিতা কৃষ্ণ ধন প্রাণ।
তোমা সব লাগিয়া কৃষ্ণের অবতার।
হেন কৃষ্ণ ভজ সবে ছাড় অনাচার॥ *(চৈতন্য-ভাগবত)*

সারারাত মদ্যপান করে জগাই-মাধাই সে-সময় দিবানিদ্রায় মগ্ন ছিল। কীর্তনের শব্দে তাদের ঘুম ভেঙে গেল। জগাই-মাধাই বাইরে বেরিয়ে এল। নিত্যানন্দের মুখে হরিনাম শুনে দুভাই ভীষণ খেপে গেল। তাদের অবস্থা দেখে নিত্যানন্দের হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে গেল। তাঁর দুচোখে অবিরল ধারায় অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগল। তিনি 'হরিবোল' 'হরিবোল' বলে কেঁদে উঠলেন।

নিত্যানন্দের এহেন অবস্থা দেখে জগাই-মাধাইয়ের মন মোটেই নরম হলো না, বরং তারা ক্রোধে জ্বলে উঠল। মাধাই একটি কলসির কানা নিয়ে নিত্যানন্দের মাথায় আঘাত করল। নিত্যানন্দের কপাল কেটে রক্ত ঝরতে লাগল। সে-অবস্থাতেও তিনি হরিনাম করতে লাগলেন। যেন তাঁর কিছুই হয়নি। এমনিভাবে তিনি মাধাইকে বললেন–

'মারিলি কলসির কানা সহিবারে পারি।
তোদের দুর্গতি আমি সহিবারে নারি॥
মেরেছিস মেরেছিস তোরা তাতে ক্ষতি নাই।
সুমধুর হরিনাম মুখে বল ভাই॥'

এ-সংবাদ শোনামাত্র গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু শিষ্যগণসহ সেখানে উপস্থিত হলেন। নিত্যানন্দের ঐ রক্তাক্ত অবস্থা দেখে তিনি ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেন। নিত্যানন্দ মহাপ্রভুকে নিরস্ত করলেন। তিনি শান্ত হলেন।

এ-ঘটনায় অনুতপ্ত হয়ে জগাই-মাধাই শ্রীগৌরাঙ্গের চরণে লুটিয়ে পড়ে। তখন শ্রীগৌরাঙ্গ সহাস্যে বললেন জগাইকে আমি ক্ষমা করতে পারি। কিন্তু মাধাই তো নিত্যানন্দের নিকট অপরাধী। আমার ভক্তকে যে কষ্ট দেয় আমি তাদের ক্ষমা করতে পারি না।

তখন নিত্যানন্দ গদগদ কণ্ঠে মহাপ্রভুকে বললেন, 'আমি জানি তুমি এ দুটি জীবকে উদ্ধার করবে। তবু আমার গৌরব বাড়ানোর জন্যই আমার অনুমতির কথা বলছ। তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক, আমি মাধাইকে ক্ষমা করলাম।' এই বলে নিত্যানন্দ মাধাইকে আলিঙ্গন করলেন, শ্রীগৌরাঙ্গ তখন জগাইকে বুকে জড়িয়ে ধরে আলিঙ্গন করলেন। ভক্তগণ সমস্বরে বলে উঠলেন, 'হরিবোল', 'হরিবোল'।

এ-ঘটনার পর জগাই-মাধাই হয়ে গেল নতুন মানুষ। কৃষ্ণ, কৃষ্ণ বলতে তাদের নয়নে অশ্রু ঝরে। এমনি বড় সাধক হয়ে গেল জগাই-মাধাই। শ্রীনিত্যানন্দের এ-ক্ষমাই মহাপাপী জগাই-মাধাইকে সাধকে পরিণত করেছিল। এটাই ক্ষমার আদর্শ।

একক কাজ : শ্রীনিত্যানন্দের আদর্শ সম্পর্কে পাঁচটি বাক্য লেখ।

উপাখ্যানের শিক্ষা : ক্ষমা মহত্ত্বের লক্ষণ। ক্ষমা দ্বারা অসৎ মানুষকে সৎ এবং দুর্জয় শত্রুকেও বশ করা যায়।

পাঠ ৪ : জীবসেবা

জীবসেবার ধারণা

জীবসেবা একটি নৈতিক মূল্যবোধ। জীবের মঙ্গলের জন্য আমরা যে-কাজ করি, তার নাম জীবসেবা। হিন্দুধর্ম অনুসারে জীবসেবা অবশ্যকরণীয়। এর কারণ জীবের মধ্যে আত্মারূপে ঈশ্বর অবস্থান করেন। তাই জীবসেবা মানে ঈশ্বরের সেবা। জীবের সেবা করলে ঈশ্বর সন্তুষ্ট হন।

পুরাকালে রন্তিদেব নামে এক রাজা জীবসেবার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। তাঁর সেই জীবসেবার উপাখ্যানটি শোনাচ্ছি :

উপাখ্যান : রাজা রন্তিদেবের জীবসেবা

পুরাকালে এক ধার্মিক রাজা ছিলেন। তাঁর নাম ছিল রন্তিদেব। তিনি ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত। একবার তিনি 'অযাচক ব্রত' গ্রহণ করে শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা শুরু করলেন।

অযাচক ব্রত হচ্ছে, কারো কাছে কিছু চাওয়া যাবে না, এমনকি খাদ্য পর্যন্ত না। কেউ যদি ইচ্ছে করে খেতে দেয়, তবে খাওয়া যাবে। কেউ ইচ্ছে করে কিছু দিলে, তা দিয়েই জীবন রক্ষা করতে হবে।

শুরু হলো রাজা রন্তিদেবের অযাচক ব্রত।

এক দিন
দুই দিন
তিন দিন

এভাবে আটচল্লিশ দিন কাটল। রাজা রন্তিদেব অনাহারেই রইলেন। তিনি কারো কাছে কিছু খেতে চাননি, কেউ ইচ্ছে করে কিছু খেতেও দেয়নি।

উনপঞ্চাশতম দিনের সকাল।

রন্তিদেবকে একজন কিছু ভাত আর মিষ্টান্ন দিয়ে গেলেন। 'যাক, এবার তাহলে খাদ্য খেয়ে প্রাণ বাঁচবে।' –ভাবলেন রাজা রন্তিদেব।

রাজা রন্তিদেব হাত-মুখ ধুয়ে নিলেন। খেতে বসলেন। এমন সময় হঠাৎ উপস্থিত হলেন একটি লোক। যেন মাটি ফুঁড়ে উঠলেন। কঙ্কালসার চেহারা। আবার তাঁর সঙ্গে ছিল একটা কুকুর। কুকুরটার চেহারাও লোকটির মতোই হাড়-জিরজিরে। লোকটি রাজা রন্তিদেবকে বললেন,

পাঁচ দিন ধরে কিছুই খেতে পাইনি। আমার কুকুরটাও আমার মতোই না খেয়ে আছে। দয়া করে আমাদের কিছু খেতে দিন। লোকটি হাঁপাচ্ছে। কুকুরটিও ক্ষুধায় ধুঁকছিল।

রাজা রন্তিদেবের মন কেঁদে উঠল।

আহা! জীবেরা কষ্ট পাচ্ছে!

জীবের মধ্যে যে আত্মারূপে ঈশ্বর বাস করেন!

জীবের কষ্ট তো ঈশ্বরের কষ্ট!

রাজা অন্যের কাছ থেকে পাওয়া খাদ্যটুকু ক্ষুধার্ত লোকটি আর তাঁর কুকুরটিকে দিয়ে দিলেন।

জীবসেবার কী সুমহান দৃষ্টান্ত!

হঠাৎ ঘটল এক আশ্চর্য ঘটনা।

রাজা রন্তিদেব তাকিয়ে দেখেন, সেই ক্ষুধার্ত লোকটি আর তাঁর কুকুর সামনে নেই। তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে আছেন স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ।

রন্তিদেব লুটিয়ে পড়লেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণে।

রাজা রন্তিদেবকে আশীর্বাদ করলেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। বললেন : রন্তিদেব, তোমার জীবসেবার এ-দৃষ্টান্ত অমর হয়ে থাকবে। আসলে ক্ষুধার্তের রূপ ধরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণই এসেছিলেন।

উপাখ্যানের শিক্ষা

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আর রন্তিদেবের এ উপাখ্যানের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করা হয়েছে জীবসেবার মাহাত্ম্য। জীবসেবা একটি নৈতিক গুণ। জীবসেবাও ধর্ম।

আমরাও জীবের সেবা করব।

তাহলে জীবের মধ্যে আত্মারূপে যে ঈশ্বর আছেন, তিনি সন্তুষ্ট হবেন। জীবের মঙ্গল হবে। আমাদেরও মঙ্গল হবে।

একক কাজ : * অযাচক ব্রত সম্পর্কে পাঁচটি বাক্য লেখ।
* উপাখ্যানের শিক্ষা প্রয়োগের কয়েকটি ক্ষেত্র চিহ্নিত কর।

নতুন শব্দ : অযাচক ব্রত।

পাঠ ৫ : কর্তব্যনিষ্ঠা

কর্তব্যনিষ্ঠার ধারণা

আমরা আমাদের পরিবারে ও সমাজে নানারকমের কাজ করি। আমাদের মধ্যে যারা শিক্ষার্থী, তাদের কাজ কী? এর উত্তর হবে : ভালো করে লেখাপড়া করা এবং জ্ঞান অর্জন করা। যাঁরা চাকরি করেন, তাঁদের নিজেদের কাজ যত্নের সঙ্গে করতে হয়।

যার যে-কাজের দায়িত্ব, তাকে সে-কাজ করতে হবেই। একেই বলে কর্তব্য। আর কর্তব্যের প্রতি শ্রদ্ধা ও গভীর মনোযোগ থাকাকে বলে কর্তব্যনিষ্ঠা।

সুতরাং 'কর্তব্যনিষ্ঠা' শব্দটির মানে হলো নিজের করণীয় কাজের প্রতি গভীর মনোযোগ।

এ-কর্তব্যনিষ্ঠা একটি নৈতিক গুণ এবং ধর্মের অঙ্গ।

পড়ালেখা করে জ্ঞান অর্জন করা শিক্ষার্থীর কর্তব্য। আমি শিক্ষার্থী। আমি মন দিয়ে পড়ালেখা করলাম না। তার ফল কী হবে? আমি পরীক্ষায় ভালো ফল করতে পারব না। প্রকৃত জ্ঞানও অর্জন করতে পারব না। তাই কর্তব্য পালন না করলে নিজের ক্ষতি হয়।

সমাজেও মানুষকে নির্দিষ্ট কর্তব্য পালন করতে হয়। সে-কর্তব্য পালনে কেউ অবহেলা করলে, তাতে গোটা সমাজেরই ক্ষতি হয়। মোটকথা, কর্তব্যনিষ্ঠা ব্যক্তির চরিত্রকে উন্নত করে, তার মঙ্গল করে এবং এতে সমাজেরও উপকার হয়। কারণ ব্যক্তি নিয়েই তো সমাজ।

মহাভারত থেকে কর্তব্যনিষ্ঠার একটি উপাখ্যান সংক্ষেপে বলছি :

উপাখ্যান : আরুণির কর্তব্যনিষ্ঠা

অনেক অনেক কাল আগের কথা। শিক্ষার্থীরা গুরুগৃহে গিয়ে থাকত। পড়ালেখা শেষ করে নিজেদের বাড়িতে ফিরে যেত। শিক্ষার্থীরা গুরুগৃহকে নিজেদের বাড়ির মতোই মনে করত। গুরুও শিক্ষার্থীদের নিজের সন্তানের মতো ভালোবাসতেন।

এমনি এক শিক্ষার্থী ছিলেন আরুণি। তাঁর গুরু ছিলেন ঋষি ধৌম্য।

তখন বর্ষাকাল।

বর্ষার জলের তোড়ে মাঠে ঋষি ধৌম্যের একখণ্ড জমির আল ভেঙে গিয়েছিল। ঋষি ধৌম্য আরুণিকে

বললেন : যাও জমিটার আল বেঁধে এসো।

আরুণি মাঠে গেলেন জমির আল বাঁধতে। কিন্তু জলের কী তীব্র বেগ!

কিছুতেই আরুণি আল বাঁধতে পারলেন না। তখন নিজেই শুয়ে পড়ে জলের তোড় ঠেকালেন। এদিকে দিন পেরিয়ে নামল সন্ধ্যা। ঋষি ধৌম্যের অন্য শিক্ষার্থীরা সব ফিরে এসেছেন। কিন্তু আরুণির দেখা নেই। চিন্তিত ঋষি ধৌম্য। তিনি অপর দুই শিষ্য উপমন্যু আর বেদকে নিয়ে গেলেন সেই জমির কাছে। আরুণির নাম ধরে চিৎকার করে ডাকতেই আরুণি উঠে এলেন। জানালেন, তিনি নিজে শুয়ে পড়ে জমির ভেতর জল ঢোকা বন্ধ করেছেন। আরুণিকে যে-কাজ দেওয়া হয়েছিল, আরুণি তা যত্নের সঙ্গে পালন করেছেন। আরুণির কাজের প্রতি এই যে মনোযোগ, এরই নাম কর্তব্যনিষ্ঠা।

ঋষি ধৌম্য খুব খুশি হলেন। আরুণিও তাঁর কর্তব্যনিষ্ঠার গুণে বিখ্যাত হয়ে রইলেন। আমরাও আরুণির মতো হব। অর্জন করব কর্তব্যনিষ্ঠার মতো নৈতিক গুণ।

উপাখ্যানের শিক্ষা

কর্তব্যনিষ্ঠা ব্যক্তির চরিত্রকে মহৎ করে। তার মঙ্গল করে। আরুণির কর্তব্যনিষ্ঠা তাঁর চরিত্রকে মহৎ করেছে। তিনি কর্তব্যনিষ্ঠার জন্য গুরুদেবের প্রিয়পাত্র হয়েছেন। সকলের কাছে সম্মানিত হয়েছেন। স্থাপন করেছেন কর্তব্যনিষ্ঠার এক অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত। আমরাও আরুণির মতো কর্তব্যনিষ্ঠ হব।

একক কাজ : তোমারা গুরুজনের প্রতি যেসকল দায়িত্ব পালন করবে তার একটি তালিকা তৈরি কর।

পাঠ ৬ : ভ্রাতৃপ্রেম

ভ্রাতৃপ্রেমের ধারণা

কাজল আর সজল। দুই ভাই। দুজনে খুব মিল। কাজলের খুশিতে সজল খুশি হয়। সজলের খুশিতে কাজল খুশি হয়। আবার কাজল কষ্ট পেলে সজল কষ্ট পায়। সজল কষ্ট পেলে কাজল কষ্ট পায়। এই যে কাজলের ও সজলের একের অন্যের প্রতি ভালোবাসা বা মমতা, একেই বলে ভ্রাতৃপ্রেম। ভ্রাতৃ মানে ভাই।

আমাদের পরিবারে ও সমাজে ভ্রাতৃপ্রেম খুবই দরকারি একটি নৈতিক গুণ। যেসকল নৈতিক গুণের জন্যে পরিবার শান্তিপূর্ণ ও আনন্দময় থাকে, সেগুলোর মধ্যে ভ্রাতৃপ্রেম একটি। আর প্রতিটি পরিবার শান্তিপূর্ণ থাকলে গোটা সমাজও শান্তিপূর্ণ থাকবে।

রামায়ণে ভ্রাতৃপ্রেমের দৃষ্টান্ত রয়েছে। শোনা যাক সেই উপাখ্যান।

উপাখ্যান : ভরত ও লক্ষ্মণের ভ্রাতৃপ্রেম

অযোধ্যার রাজা দশরথের চার ছেলে– রাম, ভরত, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন। রামের জননী ছিলেন কৌশল্যা। কৈকেয়ী ছিলেন ভরতের জননী। লক্ষ্মণ আর শত্রুঘ্নের জননী ছিলেন সুমিত্রা।

নিয়ম অনুসারে রাজার অবর্তমানে যুবরাজ হন বড় ছেলে এবং রাজার মৃত্যুর পর তিনিই রাজ্যভার গ্রহণ করেন। এ-নিয়ম মেনে বড় ছেলে রামকে রাজা দশরথ যুবরাজ হিসেবে ঘোষণা দেবেন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। এ-অনুষ্ঠানকে বলা হয় অভিষেক অনুষ্ঠান। যুবরাজের পদে রামের অভিষেক হবে। অনুষ্ঠানের আয়োজন চলছে।

কিন্তু বাধা হয়ে দাঁড়ালেন কৈকেয়ী– তাঁর বাপের বাড়ি থেকে আনা বৃদ্ধ গৃহকর্মী মন্থরার পরামর্শে।

একবার রাজা দশরথ অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। রানি কৈকেয়ী খুব যত্ন করে তাঁর সেবা করেছিলেন। রাজা দশরথ তখন খুশি হয়ে তাঁকে দুটি বর দিতে চেয়েছিলেন।

বর দেওয়া মানে ইচ্ছে পূরণ করা। দশরথ কৈকেয়ীর দুটি ইচ্ছে পূরণ করতে চেয়েছিলেন। কৈকেয়ী বলেছিলেন : প্রয়োজনমতো চেয়ে নেব।

মন্থরা কৈকেয়ীকে নিজের ছেলেকে রাজা করার সুযোগ নিতে বললেন। পাওনা বর দুটি চেয়ে নেওয়ার এটাই হলো উপযুক্ত সময়। এক বরে রাম চোদ্দ বছরের জন্য বনে যাবেন। আরেক বরে তাঁর জায়গায় ভরত যুবরাজ হয়ে রাজত্ব চালাবেন।

কৈকেয়ী দশরথের কাছে ঐ দুটি বর চাইলেন। রাজা দশরথ স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। তিনি জ্ঞান হারালেন।

কথাটা রামের কানে গেল।

রাম পিতৃসত্য পালনের জন্য বনে যাবেন বলে ঠিক করলেন। তাঁর স্ত্রী সীতাও তাঁর সঙ্গে যাবেন।

লক্ষ্মণ চিন্তা করলেন, বনে দাদা-বৌদির কষ্ট হবে। তাই তাঁদের সঙ্গে তিনিও বনে যাবেন বলে ঠিক করলেন।

ভরত আর শত্রুঘ্ন তখন ছিলেন ভরতের মামাবাড়িতে। রাম, সীতা ও লক্ষ্মণ বনে যাত্রা করার পর দশরথ প্রাণত্যাগ করেন। খবর পেয়ে ভরত মামাবাড়ি থেকে ছুটে আসেন অযোধ্যায়।

খুবই দুঃখ পেলেন ভরত। একদিকে পিতার মৃত্যু, অন্যদিকে প্রাণপ্রিয় ভাই রাম ও লক্ষ্মণের বনবাস আর সবই ঘটেছে তাঁর মায়ের জন্যে। মাকে খুব ভর্ৎসনা করলেন ভরত।

এখন ভরতকে রাজ্যভার নিতে হবে। বসতে হবে সিংহাসনে। চোদ্দ বছরের জন্যে। কিন্তু ভরত সিংহাসনে না বসে ছুটলেন রামের সন্ধানে, রামকে ফিরিয়ে আনার জন্যে। শত অনুরোধেও রাম ফিরলেন না। তখন ভরত তাঁর পাদুকা মাথায় করে নিয়ে ফিরে এলেন। পাদুকাজোড়া বসালেন সিংহাসনে। বললেন, রামই প্রকৃত রাজা। আমি তাঁর হয়ে রাজত্ব চালাব। আমিও চোদ্দ বছর বনবাসীর মতো জীবনযাপন করব।

চোদ্দ বছর পরে রাম ফিরে এলে ভরত রাজ্য ফিরিয়ে দিলেন। রামও ভরতকে যুবরাজ হিসেবে ঘোষণা দিলেন। লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নকেও দিলেন উপযুক্ত দায়িত্ব। লক্ষ্মণ ও ভরতের এ-ভ্রাতৃপ্রেম রামায়ণে উজ্জ্বল হয়ে আছে।

উপাখ্যানের শিক্ষা

ভ্রাতৃপ্রেম পরিবারকে শৃঙ্খলামণ্ডিত করে এবং শান্তিপূর্ণ রাখে। রামকে বনবাস থেকে ফিরিয়ে আনতে যাওয়া, তাঁর প্রতিনিধি হয়ে রাজত্ব চালানো, চোদ্দ বছর পর রামকে রাজ্য ফিরিয়ে দেওয়া– এসব আচরণের মধ্যে ভরতের ভ্রাতৃপ্রেম প্রকাশ পেয়েছে।

ভাইয়ের দুঃখে ভাইয়ের প্রাণ কাঁদে। রামের বনগমনের দুঃখ লক্ষ্মণের হৃদয়ে আঘাত হেনেছিল। তাই তিনি রামের সঙ্গে বনবাসে গিয়েছিলেন। লক্ষ্মণের এ-আচরণের মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয়েছে ভ্রাতৃপ্রেমের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

একক কাজ : ভ্রাতৃপ্রেম বিষয়ে একটি গল্প লেখ।

দলীয় কাজ : ভ্রাতৃপ্রেমের শিক্ষা প্রয়োগ করা যায় এমন পাঁচটি ক্ষেত্র চিহ্নিত কর।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ কর :

১. মানবচরিত্রের অন্যান্য গুণের মধ্যে ..... একটি মহৎ গুণ।

২. সর্বত্রই ..... জয় হয়।

৩. পরিবারই ..... আদর্শ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান।

৪. নৈতিক শিক্ষা অর্জনের জন্য প্রয়োজন মানবিক .....।

৫. রামচন্দ্রের বনগমনের কাহিনীটি ..... উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

ডানপাশ থেকে শব্দ বা বাক্যাংশ এনে বাম পাশের সাথে মিল কর :

বামপাশ	ডানপাশ
১. অনুতপ্ত অপরাধীকে শাস্তি	কহ কৃষ্ণ নাম
২. আমরা ধর্মের গুণাবলি	তারা অধৈর্য হতে পারে
৩. শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু বললেন	না দিয়ে ছেড়ে দেওয়াকে ক্ষমা বলে
৪. বল কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ	অর্জন করতে চেষ্টা করব
৫. ভক্তগণ সমস্বরে বলে উঠলেন	'কৃষ্ণ নাম কর'
	'হরিবোল'! 'হরিবোল'

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

১. সত্যকামের মায়ের নাম কী?

ক. সুমিত্রা খ. রাজকুমারী
গ. চন্দ্রমণি ঘ. জবালা

২. সত্যবাদিতা বলতে বোঝায়–

i. সদাচরণ করা
ii. কোনো কিছু গোপন করা
iii. অকপটে সবকথা খুলে বলা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. i ও ii
গ. ii ও iii ঘ. i ও iii

নিচের অনুচ্ছেটি পড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

প্রাপ্তি ছাত্রী হোস্টেলে থেকে পড়াশুনা করে। সে তার বাবা-মা, শিক্ষক ও গুরুজনের কথা মেনে চলে। সে বাড়িতে ও বিদ্যালয়ের সকল কর্তব্য যথাসময়ে সূচারুরূপে সম্পন্ন করে। একদিন তার হোস্টেল তত্ত্বাবধায়ক গীতাদেবীর ভীষণ জ্বর হয়। প্রাপ্তি সারারাত জেগে নিষ্ঠার সাথে সেবা করে তাঁকে সুস্থ করে তোলে।

৩. প্রাপ্তির আচরণের মধ্যে নৈতিক শিক্ষার কোন দিকটি ফুটে উঠেছে?

ক. সত্যবাদিতা খ. ক্ষমা

গ. জীবসেবা ঘ. কর্তব্যনিষ্ঠা

৪. প্রাপ্তির আচরণে প্রকাশিত শিক্ষার সাথে তোমার পঠিত উপাখ্যানের কোন চরিত্রের মিল খুঁজে পাওয়া যায়?

ক. লক্ষণের ভ্রাতৃপ্রেম খ. আরুণির গুরুভক্তি

গ. সিদ্ধার্থের জীবসেবা ঘ. নিত্যানন্দের ক্ষমা

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১. নৈতিক শিক্ষার কয়েকটি উদাহরণ দাও।

২. জীবসেবার ধারণাটি উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর।

৩. কর্তব্যনিষ্ঠার গুরুত্ব ও প্রয়োগক্ষেত্র ব্যাখ্যা কর।

বর্ণনামূলক প্রশ্ন :

১. সত্যবাদিতা বলতে কী বোঝ? সত্য বলার উপকারিতা লেখ।

২. জীবসেবার একটি ঘটনা লেখ।

৩. ক্ষমার আদর্শ গঠনে পরিবারের ভূমিকা ব্যাখ্যা কর।

সৃজনশীল প্রশ্ন :

সুরেশ তার প্রতিবেশী দ্বিজেনবাবুর জমি দখল করে নেয়। ফলে দুই পরিবারের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ চলছিল। কিন্তু এক পর্যায়ে সুরেশ জটিল রোগে আক্রান্ত হলে দ্বিজেনবাবু সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। এ-ঘটনায় সুরেশের মনে কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনা হয় এবং সে দ্বিজেনবাবুর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে। দ্বিজেনবাবু সুরেশকে বুকে জড়িয়ে ধরে ক্ষমা করে দেন।

ক. ধর্মের বাহ্য লক্ষণ কয়টি? ১

খ. অপরাধীকে ক্ষমা করা হয় কেন ব্যাখ্যা কর। ২

গ. দ্বিজেনবাবুর ক্ষমার মধ্যে তোমার পঠিত উপাখ্যানের কার নৈতিক আদর্শ ফুটে উঠেছে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'সুরেশের অনুশোচনা যেন মাধাইয়ের অনুশোচনার অনুরূপ'– তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

সপ্তম অধ্যায়

আদর্শ জীবনচরিত

ভারতবর্ষে অনেক মহাপুরুষ ও মহীয়সী নারী জন্মগ্রহণ করেছেন। আজীবন তাঁরা জগতের কল্যাণ করেছেন। মানুষের মঙ্গল করেছেন। তাঁদের জীবনী থেকে আমরা অনেক কিছু শিখতে পারি। আমাদের জীবন সুন্দরভাবে গড়ে তোলার অনুপ্রেরণা লাভ করতে পারি। তাই তাঁদের জীবনী আমাদের কাছে আদর্শ জীবনচরিত হিসেবে বিবেচ্য। এ-অধ্যায়ে পাঁচজন আদর্শ মহাপুরুষ এবং মহীয়সী নারীর জীবনচরিত বর্ণনা করা হলো। তাঁরা হলেন শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরামকৃষ্ণ, রানি রাসমণি, বামাক্ষেপা ও লোকনাথ ব্রহ্মচারী।

এ অধ্যায় শেষে আমরা–

- শ্রীকৃষ্ণের বাল্যকালের জীবনাদর্শ বর্ণনা করতে পারব
- নৈতিক চরিত্র গঠনে শ্রীকৃষ্ণের জীবনাদর্শের শিক্ষা ব্যাখ্যা করতে পারব
- নৈতিকতা গঠনে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনাদর্শের শিক্ষা বর্ণনা করতে পারব
- রানি রাসমণির জীবনাদর্শ সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারব
- রানি রাসমণির সংস্কারমূলক কার্য বর্ণনা করতে পারব
- নৈতিক চরিত্র গঠনে বামাক্ষেপার জীবনাদর্শ বর্ণনা করতে পারব
- নৈতিক চরিত্র গঠনে লোকনাথ ব্রহ্মচারীর জীবনাদর্শ বর্ণনা করতে পারব
- মহাপুরুষ ও মহীয়সী নারীদের জীবনাদর্শের শিক্ষা নিজ জীবনাচরণে মেনে চলতে উদ্বুদ্ধ হব
- পাঠ্যপুস্তক-বহির্ভূত মহাপুরুষ-মহীয়সী নারীদের জীবনী ও অবদান সম্পর্কে অনুসন্ধান পরিচালনা করতে পারব।

পাঠ ১ : শ্রীকৃষ্ণ

শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান– 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্'। জগতের কল্যাণের জন্য তিনি মানবরূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। দুষ্টকে দমন করে তিনি শিষ্টকে পালন করেছিলেন। আমরা এখানে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যকালে তিনি যে অবদান রেখেছেন, তার ভিত্তিতে জীবনাদর্শ আলোচনা করছি।

তখন দ্বাপর যুগ। মথুরায় রাজত্ব করতেন রাজা কংস। তিনি ছিলেন ভীষণ অত্যাচারী। নিজের পিতা উগ্রসেনকে বন্দি করে সিংহাসন দখল করেন।

কংসের খুড়তুতো বোন দেবকী। পরমা সুন্দরী। দেবকীকে কংস খুব ভালোবাসেন। তাই আদর করে রাজা শূরের পুত্র বসুদেবের সঙ্গে তাঁর বিয়ে দেন। বসুদেব ছিলেন পরম ধার্মিক ও রূপবান। বসুদেবের সঙ্গে বোনের বিয়ে হওয়ায় কংস খুব খুশি। তাই নিজে রথ চালিয়ে তিনি তাঁদের রাজ্যে পৌঁছে দিচ্ছিলেন। এমন সময় দৈববাণী হলো– 'শোনো কংস, দেবকীর অষ্টম গর্ভের সন্তান তোমায় হত্যা করবে।'

একথা শুনে কংস ভীষণ ক্ষেপে গেলেন। তিনি তরবারি দিয়ে দেবকীকে হত্যা করতে উদ্যত হলেন। তখন বসুদেব মিনতি করে বললেন, 'আপনি ওকে হত্যা করবেন না। আমরা আমাদের প্রতিটি সন্তানকে জন্মমাত্র আপনার হাতে তুলে দেব।'

বসুদেবের কথায় কংস শান্ত হলেন। তিনি রাজধানীতে ফিরে বসুদেব ও দেবকীকে কারাগারে আটকে রাখলেন। একে একে তাঁদের ছয়টি পুত্রসন্তান হলো। বসুদেব তাদেরকে কংসের হাতে তুলে দিলেন। কংস তাদের পাথরে আছড়ে হত্যা করলেন।

দেবকীর সপ্তম সন্তান বলরাম। ভগবান তাঁকে দেবকীর গর্ভ থেকে বসুদেবের প্রথম স্ত্রী রোহিণীর গর্ভে নিয়ে যান।

দেবকীর অষ্টম গর্ভের সন্তান শ্রীকৃষ্ণ। ভাদ্র মাসের কৃষ্ণা অষ্টমী তিথিতে তাঁর জন্ম। সেদিন প্রচণ্ড ঝড়-বৃষ্টি হচ্ছিল। বসুদেব তাকিয়ে দেখলেন কারাকক্ষের দরজা খোলা। কারারক্ষীরা সব ঘুমে অচেতন। কোথাও কেউ জেগে নেই। ঘুটঘুটে অন্ধকার। ঐ অবস্থায়ই বসুদেব শিশুপুত্রকে কোলে নিয়ে, নদী পার হয়ে, গোকুলে চলে গেলেন। সেখানেও সবাই ঘুমে অচেতন। তিনি নন্দরাজার বাড়িতে ঢুকলেন। তাঁর স্ত্রী যশোদার পাশে কেবল-জন্ম-নেওয়া একটি মেয়েশিশু ঘুমাচ্ছে। বসুদেব মেয়েটিকে কোলে নিয়ে নিজের পুত্রকে সেখানে রাখলেন। তারপর দ্রুত চলে এলেন কংসের কারাগারে। মেয়েটিকে শুইয়ে দিলেন দেবকীর পাশে।

কারাগারের দরজা আবার বন্ধ হয়ে গেল। কারারক্ষীরা জেগে উঠলেন। পরের দিন প্রভাতে সবাই দেখল, দেবকীর এক মেয়ে হয়েছে। কংস এসে যখন মেয়েটিকে আছড়ে মারতে গেলেন, তখন সে হঠাৎ আকাশে উঠে গেল এবং কংসকে উদ্দেশ করে বলল, 'তোমাকে বধিবে যে গোকুলে বাড়িছে সে।'

একথা শুনে কংস ভয়ে চমকে উঠলেন। ক্রোধে ক্ষিপ্তও হলেন। তিনি তক্ষুনি আদেশ দিলেন গোকুলে যত শিশু আছে সবাইকে মেরে ফেলতে।

কংসের আদেশে পূতনা রাক্ষসীকে ডাকা হলো এবং তাকে বলা হলো গোকুলের সমস্ত শিশুকে মেরে ফেলতে হবে। বিনিময়ে তাকে প্রচুর স্বর্ণমুদ্রা দেওয়া হবে।

স্বর্ণমুদ্রার লোভে পূতনা এক সুন্দরী নারীর রূপ ধরে গোকুলে চলল। প্রথমেই গেল নন্দরাজের বাড়ি। কেঁদে কেঁদে যশোদাকে বলল, 'মা, আমি বড়ই দুঃখিনী। আমার দুধের শিশু মারা গেছে। আমার কোনো টাকা-পয়সা চাইনে। দুবেলা দুটো খেতে দিও। বিনিময়ে আমি তোমার শিশুপুত্রকে পালন করব।'

পূতনার কথায় যশোদার মায়া হলো। তিনি পূতনাকে কাজে রাখলেন। একদিন পূতনা কৃষ্ণকে কোলে নিয়ে বাইরে গেল। চারদিকে তাকিয়ে দেখল কেউ নেই। তখন নিজের স্তন কৃষ্ণের মুখে ঢুকিয়ে দিল। স্তনে মাখানো ছিল তীব্র বিষ। তার ধারণা ছিল, এই বিষে কৃষ্ণের মৃত্যু হবে। কিন্তু কৃষ্ণ তো ভগবান। শিশু হলেও তিনি সবই বুঝতে পারলেন। তাই পূতনার স্তনে এমন টান দিলেন যে, তাতে পূতনারই মৃত্যু হলো। এভাবে পূতনাকে বিনাশ করে তিনি গোকুলের শত শত শিশুকে বাঁচালেন।

পূতনার মৃত্যুসংবাদ পেয়ে কংস খুবই চিন্তিত হলেন। তিনি ভাবলেন, কোনো নারীর পক্ষে কৃষ্ণকে মারা সম্ভব নয়। তাই তিনি তাঁর এক শক্তিশালী পুরুষ অনুচরকে ডাকলেন। তাকে সব বুঝিয়ে বললেন। অনুচর বলল, 'মহারাজ, চিন্তা করবেন না। আজ সূর্যাস্তের মধ্যেই আপনি শত্রুর মৃত্যুসংবাদ পাবেন।' এই বলে অনুচর গোকুলের দিকে চলল। সোজা গিয়ে উঠল নন্দরাজার বাড়িতে। মা যশোদা তখন একটা শকট বা গাড়ির নিচে কৃষ্ণকে শুইয়ে রেখে কাজ করছিলেন। এই সুযোগে অনুচর শকট চাপা দিয়ে কৃষ্ণকে মারতে এগিয়ে গেল। কৃষ্ণ তার মনোভাব বুঝতে পারলেন। তাই সজোরে এক লাথি মারলেন। ফলে শকটের চাপে অনুচর মারা গেল। এভাবে কৃষ্ণ কংসের অনুচরের হাত থেকেও গোকুলের শিশুদের রক্ষা করলেন।

এবার কংস তৃণাবর্ত নামক এক অসুরকে পাঠালেন কৃষ্ণকে মারার জন্য। তৃণাবর্ত গোকুলে গিয়ে প্রচণ্ড ঘূর্ণিবায়ুর সৃষ্টি করল। সমস্ত গোকুল ভীষণ ঝড়ে অন্ধকার হয়ে গেল। তৃণাবর্তের উদ্দেশ্য কৃষ্ণকে অনেক উঁচুতে তুলে আছড়ে মারবে। ঘূর্ণিবায়ুর ফলে কৃষ্ণ অনেক উঁচুতে উঠে এলেন বটে। কিন্তু তাঁকে আছাড় মারার আগে তিনিই তৃণাবর্তের বুকে দিলেন ভীষণ চাপ। ফলে মটিতে পড়ে সে মারা গেল। এভাবে শ্রীকৃষ্ণ শৈশব অবস্থায়ই দুষ্টের দমন করে শিষ্টের পালন করেছেন।

শ্রীকৃষ্ণের এই জীবনী থেকে আমরা এই নীতিশিক্ষা পাই যে, ভগবান সর্বদা দুষ্টের দমন করেন এবং শিষ্টের পালন করেন। মানবরূপে জন্ম নিয়ে তিনি দুর্জনদের হত্যা করে জগতের মঙ্গল করেন। ভগবান সহায় থাকলে দুষ্টরা কিছু করতে পারে না। তিনিই সবাইকে রক্ষা করেন। তাই আমরা সবাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে ভক্তি করব। তাঁর জীবনাদর্শ অনুসরণে সাহসী ভূমিকা নিয়ে শিশুদের কল্যাণে এগিয়ে যাব।

একক কাজ : শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা সম্পর্কে পাঁচটি বাক্য লেখ ।

নতুন শব্দ : স্বয়ম্, শিষ্ট, দৈববাণী, ঘুটঘুটে, কারাগার, কারারক্ষী, ক্ষিপ্ত, পূতনা, শকট, ঘূর্ণিবায়ু।

পাঠ ২ : শ্রীরামকৃষ্ণ

ভারতের পশ্চিমবঙ্গের হুগলী জেলার কামারপুকুর গ্রামে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্ম। ১৮৩৬ খ্রিষ্টাব্দের ১৭ ফেব্রুয়ারি। তাঁর পিতা ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় এবং মাতা চন্দ্রমণি দেবী। ক্ষুদিরাম শিশুপুত্রের নাম রাখেন গদাধর। এই গদাধরই পরবর্তীকালে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস নামে জগদ্বিখ্যাত হন।

বালক গদাধর দেখতে ছিলেন খুব সুন্দর। সদাপ্রসন্ন ভাব তাঁর। প্রকৃতিকে খুবই ভালোবাসতেন। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য তাঁকে মুগ্ধ করত। আকাশে উড়ন্ত বলাকার ঝাঁক দেখে মাঝে মাঝে তিনি ভাবাবিষ্ট হয়ে পড়তেন। বাঁধাধরা লেখাপড়ায় তাঁর মন ছিল না। কিন্তু ভজন-কীর্তনের প্রতি খুব আকর্ষণ ছিল। লোকমুখে শুনে শুনে তিনি বহু স্তব-স্তোত্র এবং রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনী আয়ত্ত করে ফেলেছিলেন।

পিতার মৃত্যুর পর গদাধরের জীবনে এক অদ্ভুত পরিবর্তন আসে। তিনি কখনও শ্মশানে গিয়ে বসে থাকেন। কখনও-বা নির্জনে আমবাগানে গিয়ে সময় কাটান। সাধু-বৈষ্ণবদের দেখলে কৌতূহলভরে তাঁদের আচরণ লক্ষ করেন। তাঁদের নিকট ভজন শেখেন।

এক সময় গদাধর দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরে আসেন। তাঁর বড় ভাই রামকুমার মন্দিরের পুরোহিত। গদাধর কখনও কখনও মায়ের মন্দিরে ভাবতন্ময় হয়ে থাকেন। কখনও-বা আত্মমগ্ন অবস্থায় গঙ্গাতীরে ঘুরে বেড়ান।

রামকুমারের মৃত্যুর পর গদাধর মায়ের পূজার ভার গ্রহণ করেন। এখানেই তাঁর সাধনজীবনের শুরু। তিনি ভবতারিণীর পূজায় মন-প্রাণ ঢেলে দেন। মাকে শোনান রামপ্রসাদী আর কমলাকান্তের গান। 'মা', 'মা' বলে আকুল হয়ে যান। তাঁর আকুল আহ্বানে একদিন মা ভবতারিণী জ্যোতির্ময়ী রূপে আবির্ভূত হন।

এ-সময় গদাধরের জীবনে ঘটে আর এক পরিবর্তন। ভাবের আবেশে তিনি উন্মাদের ন্যায় আচরণ করেন। ক্রমে ক্রমে তাঁর উন্মাদনা বেড়ে যায়। এ-খবর পেয়ে মা চন্দ্রমণি তাঁকে বাড়ি নিয়ে যান এবং রাম মুখুজ্যের মেয়ে সারদাদেবীর সঙ্গে তাঁর বিয়ে দেন।

বিয়ের অল্প কিছুদিন পরেই গদাধর দক্ষিণেশ্বরে ফিরে আসেন। আবার তাঁর মধ্যে দিব্যোন্মাদনার ভাব দেখা দেয়। এ-সময় অর্থাৎ ১৮৬১ সালের শেষভাগে সিদ্ধা ভৈরবী যোগেশ্বরী দক্ষিণেশ্বরে আসেন। গদাধর তাঁকে গুরু মানেন এবং তান্ত্রিক সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন। এই ভৈরবীই গদাধরকে অসামান্য যোগী এবং অবতার পুরুষ বলে আখ্যায়িত করেন।

এরপর গদাধরের সাধনজীবনে আসেন সন্ন্যাসী তোতাপুরী। সন্ন্যাস মন্ত্রে দীক্ষিত করে তিনি গদাধরের নাম রাখেন শ্রীরামকৃষ্ণ। শ্রীরামকৃষ্ণ হিন্দুধর্মের বিভিন্ন সাধনপথ শাক্ত, বৈষ্ণব, তান্ত্রিক প্রভৃতি মতে সাধনা করেন। এমনকি ইসলাম ও খ্রিষ্ট ধর্মমতেও সাধনা করেন। সব ক্ষেত্রেই তিনি সিদ্ধিলাভ করেন। তিনি বলেন, 'নিষ্ঠার সঙ্গে সাধনা করলে সব পথেই ঈশ্বরকে লাভ করা যায়।' তাঁর উপলব্ধ সত্য হলো, **'যত মত তত পথ'**। অর্থাৎ পথ বহু হলেও লক্ষ্য এক– ঈশ্বর লাভ।

শ্রীরামকৃষ্ণের এই সাধনা ও তাঁর পরমতসহিষ্ণুতার কথা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। ফলে অনেক জ্ঞানী-গুণী দক্ষিণেশ্বরে আসতে লাগলেন। তিনি তাঁদের গল্পের মাধ্যমে অনেক জটিল তত্ত্ব বুঝিয়ে দিতেন।

প্রবীণদের পাশাপাশি তরুণরাও আসতে লাগলেন। একদিন এলেন নরেন্দ্রনাথ দত্ত। তিনি ঈশ্বর দেখেছেন এমন একজন ব্যক্তিকে খুঁজছিলেন। নরেন্দ্রনাথ সরাসরি শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রশ্ন করলেন, 'আপনি কি ঈশ্বর দেখেছেন?' উত্তরে শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, 'হ্যাঁ, নিশ্চয় দেখেছি। এই তোকে যেমন দেখছি। তোকেও দেখাতে পারি।'

নরেন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপায় ঈশ্বর দর্শন করে ধন্য হলেন এবং তাঁর শ্রীপাদপদ্মে নিজেকে সমর্পণ করলেন। এই নরেন্দ্রনাথই হলেন শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠ শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ।

পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী শুধু মুখের কথা নয়, সেগুলো তাঁর জীবনচর্চায় রূপায়িত সত্য। তিনি অহংকারশূন্য হয়ে জীবকে শিবজ্ঞানে সেবা করেছেন। জীবসেবার আদর্শে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছেন। ১৮৮৬ খ্রিষ্টাব্দের ১৫ই আগস্ট এই মহাপুরুষ পরলোক গমন করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের কয়েকটি উপদেশ :

১. পিতাকে ভক্তি কর, পিতার সঙ্গে প্রীতি কর। জগৎরূপে যিনি সর্বব্যাপী হয়ে আছেন, তিনিই মা। জননী, জন্মস্থান, বাপ-মাকে ফাঁকি দিয়ে যে ধর্ম করবে, তার ধর্ম ছাই হয়ে যাবে।

২. মা গুরুজন, ব্রহ্মময়ীস্বরূপা। যতক্ষণ মা আছে, মাকে দেখতে হবে।

৩. একমাত্র ভক্তির দ্বারা জাতিভেদ উঠে যেতে পারে। ভক্তের জাতি নেই। ভক্তি হলেই দেহ, মন, আত্মা সব শুদ্ধ হয়।

৪. ছাদের উপর উঠতে হলে মই, বাঁশ, সিঁড়ি ইত্যাদি নানা উপায়ে যেমন ওঠা যায়, তেমনি এক ঈশ্বরের কাছে যাবার অনেক উপায় আছে। প্রত্যেক ধর্মই এক-একটি উপায়।

৫. আন্তরিক হলে সব ধর্মের ভেতর দিয়েই ঈশ্বরকে পাওয়া যায়। ঈশ্বরের কাছে নানা পথ দিয়ে পৌঁছানো যায়। **'যত মত তত পথ'**।

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী থেকে আমরা এই নীতিশিক্ষা পাই যে, প্রকৃতিকে ভালোবাসতে হবে। ঈশ্বরজ্ঞানে জীবের সেবা করতে হবে। পিতা, মাতা এবং জন্মভূমিকে শ্রদ্ধা করতে হবে। সকল ধর্মকেই শ্রদ্ধা করতে হবে। তাহলে আর ধর্মীয় সংঘাত দেখা দেবে না। সকল ধর্মেরই লক্ষ্য এক– ঈশ্বরলাভ। সকল ধর্মে ভক্তি থাকলে জাতিভেদ থাকবে না। ভক্তের কোনো জাতি নেই। ভক্তিতে দেহ, মন, আত্মা শুদ্ধ হয়।

আমরা সকলে শ্রীরামকৃষ্ণের এই জীবনাদর্শ অনুসরণ করব।

একক কাজ : * শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ কীভাবে মেনে চলবে তাঁর উপদেশাবলির আলোকে লেখ।
* **'যত মত তত পথ'**– কথাটির পাঁচটি উদাহরণ লেখ।

নতুন শব্দ : পরমহংস, আবেশ, মুগ্ধ, দিব্যোন্মাদনা, শাক্ত, বৈষ্ণব, তান্ত্রিক, সিদ্ধিলাভ, শ্রীপাদপদ্ম, ব্রহ্মময়ী, সংঘাত।

পাঠ ৩ : রানি রাসমণি

রানি রাসমণি ছিলেন এক মহীয়সী নারী। গরিবের ঘরে জন্ম হলেও এক জমিদারের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। ফলে তিনি সত্য সত্যই রানির পদে অধিষ্ঠিত হন। কিন্তু রানি হলে কী হবে? তিনি কখনও বিলাসী জীবন যাপন করেননি। আজীবন ধর্মচর্চা ও জনকল্যাণমূলক কাজ করে গেছেন। এজন্য তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন।

বাংলা ১২০০ (১৭৯৩ খ্রিষ্টাব্দ) সালের ১১ আশ্বিন বুধবার রানি রাসমণির জন্ম। কলকাতার উত্তরে গঙ্গার পূর্বতীরে হালিশহরের নিকট কোনা নামক গ্রামে। পিতার নাম হরেকৃষ্ণ দাস। মাতার নাম রামপ্রিয়া দাসী। হরেকৃষ্ণ দাসের পেশা ছিল গৃহনির্মাণ ও কৃষিকাজ। জন্মের পর মা রামপ্রিয়া মেয়ের নাম রাখেন রানি। পরে তাঁর নাম হয় রাসমণি। আরও পরে দুটি নাম একত্রিত হয়ে প্রতিবেশীদের কাছে তিনি রানি রাসমণি নামে পরিচিত হন। বাংলা ১২১১ (১৮০৪ খ্রিষ্টাব্দ) সালের ৮ বৈশাখ জমিদার রাজচন্দ্র দাসের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। তাঁদের চার কন্যা– পদ্মামণি, কুমারী, করুণা এবং জগদম্বা।

রাজচন্দ্র ছিলেন অত্যন্ত কর্মকুশল। তাঁর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন বুদ্ধিমতী স্ত্রী রাসমণি। এর ফলে তাঁর সাফল্য আরও বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৮১৭ খ্রিষ্টাব্দে পিতার মৃত্যুর পর রাজচন্দ্র বিশাল সম্পদের অধিকারী হন। কিন্তু ব্যবহারে তিনি ছিলেন অত্যন্ত অমায়িক।

রাজচন্দ্র নিজে ছিলেন উদার প্রকৃতির মানুষ। সেইসঙ্গে যুক্ত হয়েছিল স্ত্রী রাসমণির অনুপ্রেরণা। ফলে এই জমিদার পরিবার জনকল্যাণের জন্য অনেক কাজ করে গেছেন। ১২৩০ (১৮২৩ খ্রিষ্টাব্দ) সালের বন্যায় বাংলার অনেক পরিবার অসহায় হয়ে পড়ে। রানি রাসমণি তাদের সাহায্যের জন্য বহু অর্থ ব্যয় করেন। ঐ বছরই রাসমণির পিতা পরলোক গমন করেন। রাসমণি কন্যার কর্তব্য অনুসারে পিতার পারলৌকিক ক্রিয়া করার জন্য গঙ্গার ঘাটে যান।

কিন্তু যাতায়াতের রাস্তা এবং গঙ্গার ঘাটের অবস্থা ছিল খুবই শোচনীয়। তাই জনগণের সুবিধার কথা চিন্তা করে রানি স্বামীকে অনুরোধ করেন সংস্কারের জন্য। রাজচন্দ্র বহু টাকা খরচ করে 'বাবু ঘাট' ও 'বাবু রোড' নির্মাণ করান।

রাজচন্দ্র ও রাসমণির দাম্পত্য জীবন খুব বেশি দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। ১২৪৩ (১৮৩৬ খ্রিষ্টাব্দ) সালে মাত্র ৪৯ বছর বয়সে রাজচন্দ্র ইহলোক ত্যাগ করেন। এর ফলে জমিদারির সমস্ত দায়িত্ব পড়ে রানি রাসমণির ওপর। কিন্তু জমিদারির পাশাপাশি তিনি জনকল্যাণ ও ধর্মচর্চা সমানভাবে করে গেছেন।

১২৪৫ (১৮৩৮ খ্রিষ্টাব্দ) সালে রানি রাসমণি ১,২২,১১৫ টাকা খরচ করে একটি রুপার রথ তৈরি করান। তাতে জগন্নাথ দেবকে বসিয়ে রথযাত্রার দিন পরিবারের লোকজনকে নিয়ে কলকাতার রাস্তায় শোভাযাত্রা বের করেন।

একবার তিনি পুণ্যভূমি জগন্নাথ ক্ষেত্রে যান। সেখানকার রাস্তাঘাট ছিল জরাজীর্ণ। তীর্থযাত্রীদের খুব কষ্ট হতো চলাফেরা করতে। রাসমণি তাঁদের সুবিধার কথা চিন্তা করে সমস্ত রাস্তা সংস্কার করে দেন। শুধু তা-ই নয়। ষাট হাজার টাকা ব্যয় করে তিনি জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা এই তিন বিগ্রহের জন্য হীরকখচিত তিনটি মুকুটও তৈরি করিয়ে দেন।

রানি রাসমণি অনেক জনকল্যাণমূলক কাজ করেছেন। সেসবের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য একটি হলো গঙ্গার জলকর বন্ধ করা। একবার ইংরেজ সরকার গঙ্গায় মাছ ধরার জন্য জেলেদের ওপর কর আরোপ করে। নিরুপায় জেলেরা তখন রাসমণির শরণাপন্ন হন। রাসমণি সরকারকে দশ হাজার টাকা কর দিয়ে মুসুড়ি থেকে মেটিয়াবুরুজ পর্যন্ত সমস্ত গঙ্গা জমা নেন এবং রশি টানিয়ে জাহাজ ও নৌকা চলাচল বন্ধ করে দেন। এতে সরকার আপত্তি তোলে। উত্তরে রানি বলেন যে, নদীতে জাহাজ চলাচল করলে মাছ অন্যত্র চলে যাবে। এতে জেলেদের ক্ষতি হবে। এ-অবস্থায় সরকার রানিকে তাঁর টাকা ফেরত দেয় এবং জলকর তুলে নেয়।

রানি তাঁর প্রজাদের সন্তানের ন্যায় প্রতিপালন করতেন। একবার এক নীলকর সাহেব মকিমপুর পরগনায় প্রজাদের ওপর উৎপীড়ন শুরু করেন। এ-কথা রানি শুনতে পান এবং তাঁর হস্তক্ষেপে তা বন্ধ হয়। তিনি প্রজাদের উন্নতিকল্পে এক লক্ষ টাকা খরচ করে 'টোনার খাল' খনন করান। এর ফলে মধুমতী নদীর সঙ্গে নবগঙ্গার সংযোগ সাধিত হয়। এ ছাড়া সোনাই, বেলিয়াঘাটা ও ভবানীপুরে বাজার স্থাপন এবং কালীঘাট নির্মাণ তাঁর অনন্য কীর্তি।

ধর্মচর্চার ক্ষেত্রে রানি রাসমণির সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি দক্ষিণেশ্বরে মন্দির স্থাপন। ১২৫৪ (১৮৪৭ খ্রিষ্টাব্দ) সালে রানি একদিন বিশ্বেশ্বর দর্শনের জন্য কাশীধামে যাওয়া স্থির করেন। যাত্রার পূর্বরাত্রে মা কালী তাঁকে স্বপ্নে বলেন, 'কাশী যাওয়ার আবশ্যকতা নেই, গঙ্গার তীরে আমার মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে পূজা ও ভোগের ব্যবস্থা করো। আমি ঐ মূর্তিকে আশ্রয় করে আবির্ভূত হয়ে তোমার নিকট থেকে নিত্য পূজা গ্রহণ করব।' মায়ের এই আদেশ পেয়ে রাসমণি গঙ্গার তীরে জমি কিনে মন্দির নির্মাণ করেন। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের অগ্রজ রামকুমারকে পুরোহিত নিয়োগ করা হয়। রানি সেখানে প্রতিদিন পূজা দিতেন। রামকুমারের মৃত্যুর পর রামকৃষ্ণ স্বয়ং পুরোহিতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর কারণেই ঐ মন্দির আজ দক্ষিণেশ্বর কালী মন্দির নামে খ্যাত। এখানেই রামকৃষ্ণের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় তাঁর শ্রেষ্ঠ শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দের।

১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দের ১৯ ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার রানি রাসমণি ইহধাম ত্যাগ করেন।

রানি রাসমণির জীবনী থেকে আমরা এই নীতিশিক্ষা লাভ করতে পারি যে, মানুষের জন্মের চেয়ে তার কর্মই বড়। জন্ম যেখানেই হোক, কর্মের দ্বারা মানুষ চিরস্মরণীয় হয়ে থাকতে পারে। এটাই প্রত্যেকের জীবনের লক্ষ্য হওয়া উচিত। সম্পদকে মানুষের সেবায় লাগাতে হবে। শুধু নিজের সুখই নয়, অপরের সুখের জন্যও সম্পদ ও ক্ষমতার ব্যবহার করতে হবে। কর্মের অবসরে ধর্মচর্চায় মন দিতে হবে। তাতে দেহ-মন শুদ্ধ হয়, পবিত্র হয়। এভাবে ধর্মচর্চা ও জনসেবায় আত্মনিয়োগ করতে পারলে জীবন সার্থক হয়।

একক কাজ : রানি রাসমণির সংস্কারমূলক কাজ চিহ্নিত করে কয়েকটি সংস্কারমূলক কাজের বর্ণনা কর।

নতুন শব্দ : মহীয়সী, জগদম্বা, বিশাল, অমায়িক, খচিত, জলকর, অনন্য, কীর্তি, দেবোত্তর, দানপত্র।

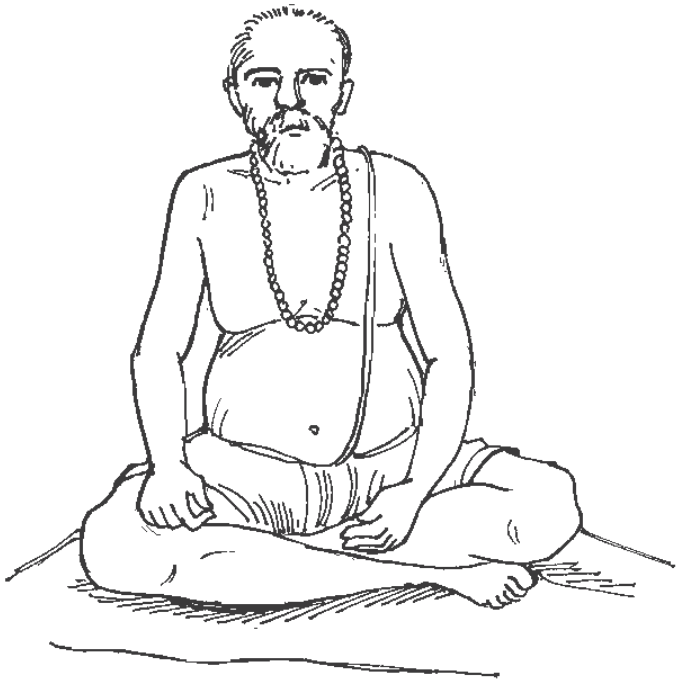

পাঠ ৪ : বামাক্ষেপা

বামাক্ষেপা ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ সাধক। তিনি তান্ত্রিক মতে সাধনা করে সিদ্ধিলাভ করেন। তাঁর সাধনার স্থল ছিল তারাপীঠ। পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলায় তারাপীঠ অবস্থিত। এখানে আরও অনেক তন্ত্রসাধক সাধনা করে সিদ্ধিলাভ করেন। যেমন– আনন্দনাথ, কৈলাসপতি প্রমুখ। তারাপীঠ হিন্দুদের একটি বিশিষ্ট তীর্থস্থান। তারাপীঠের নিকটে অটলা গ্রাম। বাংলা ১২৪৪ (১৮৩৭ খ্রিষ্টাব্দ) সালের শিব চতুর্দশী তিথিতে বামাক্ষেপা এখানে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা সর্বানন্দ চট্টোপাধ্যায়, মাতা রাজকুমারী দেবী। বামাক্ষেপা তাঁর পিতা-মাতার দ্বিতীয় সন্তান।

প্রথম সন্তান জয়কালী। এ ছাড়া দুর্গাদেবী, দ্রবময়ী ও সুন্দরী নামে তাঁর আরও তিন বোন এবং রামচন্দ্র নামে এক ভাই ছিলেন।

বামাক্ষেপার আসল নাম বামাচরণ চট্টোপাধ্যায়। পরে তারামায়ের সাধনায় তাঁর খ্যাপামি বা একরোখা ভাব দেখে সবাই তাঁকে বামাক্ষেপা বলেই ডাকতেন।

পিতা সর্বানন্দ ক্ষেত-খামারে কাজ করতেন। এতে যে সামান্য আয় হতো, তাতেই তাঁর সংসার কোনো রকমে চলে যেত।

সর্বানন্দ ছিলেন বড়ই ধর্মভীরু ও সরল প্রকৃতির মানুষ। অল্প বয়সে দীক্ষা নিয়ে তিনি তারামায়ের সাধনায় ডুবে যান। স্ত্রী রাজকুমারীও ছিলেন ধর্মপ্রাণা ও ভক্তিমতী। এমন বাবা-মায়ের সন্তান হয়ে বামাচরণও তারামায়ের ভক্ত হন। 'জয়তারা জয়তারা' বলে তিনি মাটিতে লুটোপুটি খান। বামাচরণ বড়ই সরল ও আপনভোলা। তাঁর সরলতা অন্যের চোখে ছিল পাগলামি।

প্রথাগত লেখাপড়ার প্রতি বামাচরণের মন ছিল না। পাঠশালা কোনোরকমে শেষ করে উচ্চ বিদ্যালয়ে আর যাওয়া হয়নি। তবে তাঁর একটি বিশেষ গুণ ছিল। তিনি সুমিষ্ট স্বরে গান গাইতে পারতেন। একদিন তারামায়ের মন্দিরে গানের আসর বসেছে। বেহালা বাজাচ্ছেন পিতা সর্বানন্দ। সর্বানন্দ এক সময় বামাচরণকে কৃষ্ণ সাজিয়ে দিলেন। আর বামা নেচে-নেচে মিষ্টি কণ্ঠে গান গাইতে লাগলেন। গাঁয়ের মানুষ বামার কৃষ্ণরূপ দেখে আর গান শুনে অতিশয় আনন্দ পেলেন।

একদিন বামাচরণ জেদ ধরেন শ্মশানে যাবেন। পিতা সর্বানন্দ কিছুতেই থামাতে পারেন না। অবশেষে বামাচরণকে নিয়ে তিনি শ্মশানপুরীতে গেলেন। মহাশ্মশান দেখে বামার মনে ভাবান্তরের সৃষ্টি হয়। তিনি শ্মশানভূমিকে ভালোবেসে ফেলেন।

এ ঘটনার পর বামা যেন কেমন হয়ে গেছেন। সত্যি সত্যি তিনি খ্যাপায় পরিণত হন। এ খ্যাপামি তাঁর গভীর ধর্ম নিষ্ঠার জন্য। শ্মশানভূমির সাথে, তারামায়ের সাথে তাঁর নিবিড় ভাব গড়ে উঠল। শুরু হলো বামাচরণের শ্মশানলীলা। সে-সময় শ্মশানে ছিলেন তন্ত্রসাধক ও বেদজ্ঞ মোক্ষদানন্দ। আরও ছিলেন ব্রজবাসী কৈলাসপতি। কৈলাসপতি বামাকে দীক্ষা দেন। আর মোক্ষদানন্দ দেন সাধনার শিক্ষা। শুরু হলো মহাশ্মশানে বামাচরণের তন্ত্রসাধনা।

এরপর হঠাৎ একদিন পিতা সর্বানন্দের মৃত্যু হয়। বামাচরণের বয়স তখন ১৮ বছর। সংসারের কথা ভেবে মা রাজকুমারী ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়েন। বামাকে বলেন কিছু একটা করতে। বামা একের পর এক কাজ নেন। কিন্তু কোথাও মন বসাতে পারেন না। তাঁর কেবল তারামায়ের রাঙাচরণের কথা মনে পড়ে। একবার এক মন্দিরে ফুল তোলার কাজ নেন। কিন্তু রক্তজবা তুলতে গিয়ে মনে পড়ে যায় তারামায়ের চরণযুগলের কথা। আর অমনি তিনি বেহুঁশ হয়ে পড়েন। কখনও-বা ভাবে বিভোর হয়ে গান ধরেন। একমনে গাছতলায় বসে থাকেন। ফলে তাঁর কোনো কাজই বেশিদিন টেকে না। এভাবেই তিনি বামাক্ষেপা নামে পরিচিত হয়ে ওঠেন।

বামাক্ষেপার এই খ্যাপামি চলতেই থাকে। তারামায়ের সাধনায় তিনি মন-প্রাণ ঢেলে দেন এবং একসময় সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন। তাঁর সিদ্ধিলাভের কথা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। একসময় নাটোরের মহারানি অন্নদাসুন্দরী তাঁর কথা জানতে পারেন। তারাপীঠের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে ছিল তখন নাটোরের রাজপরিবার। তাই রানির নির্দেশে বামাক্ষেপাকে তারাপীঠের পুরোহিত নিয়োগ করা হয়।

বামাক্ষেপা ছিলেন খুবই সহজ-সরল এক আত্মভোলা মানুষ। খাদ্যাখাদ্য, পূজা-মন্ত্র কোনো কিছুই তিনি মানতেন না। 'এই বেলপাতা লে মা, এই অন্ন লে মা, এই জল লে মা, এই ফুল ধূপ লে মা'। এই ছিল বামার পূজা।

বামা তারামায়ের ভক্ত হলেও নিজের মাকেও খুব শ্রদ্ধা করতেন। মা রাজকুমারী মারা যাওয়ার পর তাঁর দেহ তারাপীঠে আনা হয়। বামা তখন দ্বারকা নদীর ওপারে তারাপীঠ শ্মশানে। বর্ষাকালে নদীতে প্রচণ্ড ঢেউ। তাই ভয়ে কেউ মৃতদেহ ওপারে শ্মশানে নিতে চাইছে না। এপারেই দাহ করার আয়োজন করছে। কিন্তু মায়ের আত্মার সদ্‌গতির জন্য তারাপীঠের শ্মশানেই তাঁকে দাহ করা দরকার। একথা ভেবে বামাক্ষেপা মা-তারার নাম নিয়ে নদীতে ঝাঁপ দিলেন। এপারে এসে মায়ের শরীর নিজের সঙ্গে বেঁধে সাঁতরে ওপারে গেলেন এবং শ্মশানে মায়ের দেহ দাহ করলেন।

বামাক্ষেপা লোকশিক্ষার জন্য বলতেন :

১. ধর্ম অন্তরের জিনিস। বেশি আড়ম্বর করলে নষ্ট হয়।

২. মায়াকে জয় করতে পারলেই মহামায়ার কৃপা পাওয়া যায়।

৩. তারা মা-র করুণা পেলেও মোক্ষ পাওয়া যায়।

৪. গুরু, মন্ত্র আর ভগবান– এঁদের মধ্যে পার্থক্য ভাবতে নেই। তোমরাও ভাববে না, তোমাদের মঙ্গল হবে। কলিযুগে মুক্তিসাধনা আর হরিনাম ছাড়া জীবের গতি নেই।

৫. দিনরাত যে কালীতারা, রাধাকৃষ্ণ নাম করে, পাপ তাকে স্পর্শ করতে পারে না।

তন্ত্রসাধনায় অক্ষয় কীর্তি স্থাপন করে বামাক্ষেপা ১৩১৮ (১৯১১ খ্রিষ্টাব্দ) সালের ২রা শ্রাবণ পরলোক গমন করেন।

বামাক্ষেপার জীবনী থেকে আমরা এই নৈতিক শিক্ষা পাই যে, মনে-প্রাণে কোনোকিছু চাইলে তা পাওয়া যায়। ধর্ম অন্তর দিয়ে পালন করতে হয়। বাইরে তা নিয়ে বাড়াবাড়ি করা ঠিক নয়। দেব-দেবীর পূজায় ভক্তিই প্রধান। মন্ত্র-তন্ত্র, নিয়মকানুন প্রধান বিষয় নয়। ভক্তিভরে মা-তারা এবং রাধা-কৃষ্ণের নাম নিলে পাপ তাকে স্পর্শ করে না। পিতা-মাতাকে শ্রদ্ধা করতে হবে।

সাধক বামাক্ষেপার এই শিক্ষা আমরা আমাদের জীবনে কাজে লাগাব।

একক কাজ : বামাক্ষেপার লোকশিক্ষাসমূহ উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর।

নতুন শব্দ : ক্ষেপা, শ্মশান, বেদজ্ঞ, বেহুঁশ, আত্মভোলা, লে, দাহ।

পাঠ ৫ : শ্রীশ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী

পশ্চিমবঙ্গের একটি জেলা উত্তর চব্বিশ পরগনা। এর অন্তর্গত বারাসাত মহকুমার একটি গ্রাম চাকলা। এ গ্রামেই বাংলা ১১৩৭ (১৭৩০ খ্রিষ্টাব্দ) সনে লোকনাথের জন্ম। পিতা রামকানাই চক্রবর্তী এবং মাতা কমলা দেবী।

লোকনাথ ছিলেন তাঁর পিতা-মাতার চতুর্থ পুত্র। রামকানাইর বড়ই ইচ্ছা– তাঁর একটি পুত্র সন্ন্যাস গ্রহণ করুক। ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে বংশ পবিত্র করুক।

পিতার ইচ্ছা পূরণ করার জন্য লোকনাথ এগিয়ে এলেন। তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করবেন। একথা শুনলেন লোকনাথের বন্ধু বেণীমাধব চক্রবর্তী। তিনিও সিদ্ধান্ত নিলেন সন্ন্যাস নেবেন। আচার্য ভগবান গাঙ্গুলী হলেন তাঁদের গুরু। তিনি ছিলেন একজন যোগী পুরুষ। তিনি তাঁদের দীক্ষা দিলেন। তারপর একদিন দুই বালক ব্রহ্মচারীকে নিয়ে তিনি গৃহত্যাগ করলেন।

প্রথমে তাঁরা গেলেন কলকাতার কালীঘাটে। কালীঘাট তখন সাধন-ভজনের এক পবিত্র অরণ্যভূমি। গুরুর তত্ত্বাবধানে লোকনাথ ও বেণীমাধব কঠোর সাধনায় রত হলেন। এভাবে তাঁদের ২৫ বছর কেটে গেল। তারপর তাঁরা গেলেন কাশীধামে। গুরু ভগবান গাঙ্গুলী তখন বৃদ্ধ। শরীর খুবই দুর্বল। তাই তিনি কাশীধামের পরম সাধক হিতলাল মিশ্রের হাতে লোকনাথ ও বেণীমাধবকে তুলে দিলেন। তারপর গঙ্গার ঘাটে গিয়ে তিনি যোগবলে দেহত্যাগ করেন।

হিতলাল মিশ্র লোকনাথ ও বেণীমাধবকে নিয়ে চলে যান হিমালয়ে। সেখানে দীর্ঘকাল কঠোর সাধনা করে দুজনেই সিদ্ধিলাভ করেন। যোগবিভূতির অধিকারী হন এরপর তাঁরা দেশ পরিভ্রমণে বের হন। আফগানিস্তান, মক্কা, মদিনা, চীন প্রভৃতি দেশ ভ্রমণ করে তাঁরা হিমালয়ে ফিরে আসেন। হিতলাল তখন বলেন, 'আমার সাথে আর তোমাদের থাকার প্রয়োজন নেই। তোমরা নিজভূমিতে যাও। সেখানে তোমাদের কাজ করতে হবে।'

এবার দুই বন্ধুর বিচ্ছিন্ন হবার পালা। বেণীমাধব গেলেন ভারতের কামাখ্যার দিকে। আর লোকনাথ এলেন কুমিল্লার দাউদকান্দিতে। এখান থেকেই লোকনাথের লোকসেবা ও সাধনার নতুন জীবনের শুরু।

দাউদকান্দিতে লোকনাথ একদিন এক বটগাছের নিচে বসে ধ্যান করছেন। এমন সময় ডেঙ্গু কর্মকার নামে এক দরিদ্র লোক এসে তাঁর পা জড়িয়ে ধরলেন। বললেন, 'বাবা, আমাকে রক্ষা করুন। আমি এক ফৌজদারি মামলায় পড়েছি। রেহাই পাবার উপায় নেই।'

ডেঙ্গুকে দেখে লোকনাথের দয়া হলো। তিনি যে সর্বজীবের মধ্যেই ব্রহ্মকে খুঁজতেন। সর্বজীবের মঙ্গলসাধনই ছিল তাঁর সাধনার লক্ষ্য। তাই তিনি ডেঙ্গুকে অভয় দিয়ে বললেন, 'যা, তুই মুক্তি পাবি।' ডেঙ্গু ঠিকই মুক্তি পেলেন। তাই খুশি হয়ে তিনি লোকনাথকে তাঁর বাড়ি নিয়ে গেলেন। লোকনাথ সেখানে কিছুদিন থেকে নারায়ণগঞ্জ জেলার বারদী গ্রামে চলে গেলেন।

বারদীর জমিদার তখন নাগবাবু। তিনি একবার লোকনাথের কৃপায় জয়লাভ করেন। তাই তিনি বারদী গ্রামে লোকনাথের থাকার ব্যবস্থা করে দেন। ক্রমে সেখানে প্রতিষ্ঠিত হয় লোকনাথের আশ্রম। দলে-দলে ভক্তেরা আসতে থাকেন। লোকনাথের অলৌকিক শক্তির প্রভাবে অনেক রুগ্‌ণ মানুষ সুস্থ হন। অনেকে বিপদ থেকে উদ্ধার পান। পাপী-তাপী মুক্তি লাভ করেন। সাধকেরা সিদ্ধিলাভ করেন। এভাবে লোকনাথ 'বাবা লোকনাথ ব্রহ্মচারী' হিসেবে পরিচিত

হয়ে ওঠেন। দেশ-বিদেশে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে।

লোকনাথ জাতি, ধর্ম বা বর্ণের বিচার করতেন না। তাঁর কাছে সব মানুষই ছিল সমান। তাঁকে এক গোয়ালিনী দুধ দিতেন। লোকনাথ তাঁকে মা বলে ডাকতেন। লোকনাথের অনুরোধে গোয়ালিনী শেষে আশ্রমেই থাকতেন।

লোকনাথ শুধু মানুষ নয়, জীবজন্তু ও পশুপাখিকেও সমানভাবে ভালোবাসতেন। তাঁর আশ্রমে অনেক পশুপাখি থাকত। তিনি নিজের হাতে তাদের খাবার দিতেন। পাখিরা নির্ভয়ে তাঁর গায়ে এসে বসত। আসলে তিনি সব জীবের মধ্যেই ব্রহ্মের উপস্থিতি উপলব্ধি করতেন। তিনি মনে করতেন, ব্রহ্মের শ্রেষ্ঠ বিকাশ কল্যাণতম রূপে। তিনি বলতেন, 'যত্তে রূপং কল্যাণতমং তৎ তে পশ্যামি।'– আমি তোমার কল্যাণতম রূপই প্রত্যক্ষ করি। তাই জীবের কল্যাণ করে তিনি যে-আনন্দ পেতেন, সেটাই ছিল তাঁর ব্রহ্মানন্দ।

বাবা লোকনাথ ছিলেন অশেষ কৃপাবান মহাপুরুষ। তাই তিনি সংসারী লোকদের প্রতি পরম আশ্বাসের বাণী উচ্চারণ করে বলেছেন,

'রণে বনে জলে জঙ্গলে যখনই বিপদে পড়িবে,
আমাকে স্মরণ করিও, আমিই রক্ষা করিব।'

এই পরমপুরুষ বাবা লোকনাথ বাংলা ১২৯৭ (১৮৯০ খ্রিষ্টাব্দ) সনের ১৯শে জ্যৈষ্ঠ বারদীর আশ্রমে পরলোকগমন করেন। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল ১৬০ বছর।

লোকনাথ ব্রহ্মচারীর জীবনী থেকে আমরা এই নৈতিক শিক্ষা পাই যে, পিতা-মাতাকে শ্রদ্ধা করতে হবে। মানুষ, পশু-পাখি সকল জীবকে ভালোবাসতে হবে। জাতি, ধর্ম, বর্ণ কোনরূপ ভেদাভেদ করা যাবে না। সমাজের উঁচু-নিচু সবাইকে সমান মর্যাদা দিতে হবে। ব্রহ্মজ্ঞানে জীবের সেবা করতে হবে। সকলের মধ্যে যে আত্মা আছে, তার সঙ্গে নিজের আত্মাকে এক করে দেখতে হবে। তবেই ব্রহ্মলাভ হবে।

দলীয় কাজ : ছকে উল্লিখিত মহাপুরুষদের সম্পর্কে পাঁচটি করে বাক্য লিখে ছক পূরণ কর।	শ্রীরামকৃষ্ণ	রানি রাসমণি	বামাক্ষেপা	লোকনাথ ব্রহ্মচারী

একক কাজ : শ্রীশ্রী লোকনাথ ব্রহ্মচারী সম্পর্কে পাঁচটি বাক্য লিখ।

নতুন শব্দ : ব্রহ্মচারী, যোগীপুরুষ, ফৌজদারি, যত্তে, পশ্যামি, ব্রহ্মজ্ঞান।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ কর :

১. দেবকীর ..... গর্ভের সন্তান তোমায় হত্যা করবে।

২. মাকে শোনান ..... আর কমলাকান্তের গান।

৩. রানি রাসমণি তাঁর প্রজাদের ..... ন্যায় প্রতিপালন করতেন।

৪. মহাশ্মশান দেখে বামার মনে ..... সৃষ্টি হয়।

৫. ক্রমে সেখানে প্রতিষ্ঠিত হয় ..... আশ্রম।

ডানপাশ থেকে শব্দ বা বাক্যাংশ এনে বাম পাশের সাথে মিল কর :

বামপাশ	ডানপাশ
১. পূতনার কথায় যশোদার	কান্না পেল
২. এই নরেন্দ্রনাথই হলেন শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠ শিষ্য	তন্ত্রসাধনা
৩. তাঁর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন বুদ্ধিমতী স্ত্রী	পশ্যামি
৪. শুরু হলো মহাশ্মশানে বামাচরণের	স্বামী বিবেকানন্দ
৫. যত্তে রূপং কল্যাণতনং তৎ তে	রাসমণি
	মায়া হলো

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

১. শিশু কৃষ্ণকে কে প্রথম মেরে ফেলতে গিয়েছিল?

ক. হিড়িম্বা খ. তাড়কা

গ. পূতনা ঘ. সূর্পণখা

২. রানি রাসমণির সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি কোনটি?

ক. কালীঘাট নির্মাণ
খ. জলকর বন্ধ করা
গ. ভবানীপুরে বাজার স্থাপন
ঘ. দক্ষিণেশ্বরে মন্দির স্থাপন

৩. বামাক্ষেপাকে তারাপীঠের পুরোহিত নিয়োগ করেন কে?

ক. রানি রাসমণি
খ. চন্দ্রমণি দেবী
গ. রাজকুমারী দেবী
ঘ. মহারানি অন্নদাসুন্দরী

৪. ব্রহ্মানন্দ বলতে বোঝায়–

i. জীবের মধ্যে ব্রহ্মের উপস্থিতি
ii. ব্রহ্মজ্ঞানে জীবের সেবা
iii. জীবের কল্যাণ করে যে- আনন্দ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i
খ. ii
গ. iii
ঘ. i ও ii

নিচের অনুচ্ছেটি পড় এবং ৫ ও ৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

গোপালবাবুর ধর্ম সম্পর্কে জানার আগ্রহ খুব বেশি। তাই তিনি হিন্দুধর্মের বিভিন্ন সাধনপথ সম্পর্কে ধারণা লাভ করেন। এমনকি অন্য ধর্ম সম্পর্কেও তিনি জানতে চান। তিনি উপলব্ধি করলেন সাকার, নিরাকার কিংবা অন্য যে- পথেই সাধনা করা যায়– সবার লক্ষ্য এক ও অভিন্ন– ঈশ্বরলাভ।

৫. গোপালবাবুর আচরণে কোন সাধকের আদর্শ ফুটে উঠেছে?

ক. বামাক্ষেপা
খ. শ্রীরামকৃষ্ণ
গ. রামকুমার
ঘ. লোকনাথ ব্রহ্মচারী

৬. উক্ত সাধকের সাধনতন্ত্রের সাথে গোপাল বাবুর উপলব্ধির মিলটি হলো–

ক. যত মত তত পথ
খ. গুরু, মন্ত্র আর ভগবান এক
গ. দেব-দেবীর পূজায় ভক্তিই প্রধান
ঘ. ব্রহ্মের শ্রেষ্ঠ বিকাশ কল্যাণতম রূপে

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১. শ্রীকৃষ্ণ কেন মানবরূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন?
২. রানি রাসমণি জগন্নাথ ক্ষেত্রে গিয়ে কী ভূমিকা রাখেন?
৩. বামাক্ষেপা মায়ের আত্মার সদ্‌গতির জন্য কী করেছিলেন?
৪. লোকনাথ কাকে 'মা' বলে ডাকতেন এবং কেন?

বর্ণনামূলক প্রশ্ন :

১. কংস কর্তৃক শিশুকৃষ্ণকে হত্যার উপায়সমূহ আলোচনা কর।
২. শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনজীবনের বর্ণনা দাও।
৩. রানি রাসমণির জনকল্যাণমূলক কাজের বিবরণ দাও।
৪. লোকনাথ ব্রহ্মচারীর দৃষ্টিতে জীবসেবার গুরুত্ব বর্ণনা কর।

সৃজনশীল প্রশ্ন :

১। শান্তিলতা দেবী জনদরদি নারী। তিনি এ- বছর সিটি কর্পোরেশনের একজন মেয়র পদে নির্বাচিত হওয়ার পর তাঁর সমস্ত অর্থসম্পদ মানুষের সেবায় দান করেন। তিনি জনগণের সুবিধার কথা চিন্তা করে রাস্তা, নর্দমা সংস্কার ও শিশুদের খেলার মাঠ নির্মাণ করেন। ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে চাঁদাবাজি করা বন্ধ করে দেন। এ ছাড়া তিনি বেশ কয়েকটি মন্দির সংস্কার ও তীর্থনিবাস স্থাপন করেন। ইতোমধ্যে তাঁর সুনাম সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে।

ক. রানি রাসমণির মায়ের নাম কী? ১
খ. রানি রাসমণির 'রানি' নাম কীভাবে সার্থক হলো? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. শান্তিলতা দেবীর কর্মকাণ্ডে রানি রাসমণির কোন কর্মকাণ্ডের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. শান্তিলতা দেবীর মধ্যে রানি রাসমণির প্রভাব লক্ষ করা যায়– কথাটি মূল্যায়ন কর। ৪

২. সন্তোষবাবু চাকরির সুবাদে শহরে বসবাস করেন। তাঁর বৃদ্ধ মা-বাবা গ্রামের বাড়িতে থাকেন। একদিন তার মায়ের অসুস্থতার কথা শুনে তিনি রাতেই বাড়িতে ছুটে যান এবং দেখতে পান মা মৃত্যু শয্যাশায়ী। তিনি বিলম্ব না করে মাকে কোলে তুলে ডাক্তারের কাছে রওনা হন। কিন্তু খেয়াঘাটে এসে দেখেন নৌকা বাঁধা আছে, মাঝি নেই, বৈঠাও নেই। এ- অবস্থায় তিনি মাকে নৌকায় তুলে নদীতে ঝাঁপ দেন এবং রশি দিয়ে টেনে নৌকা ওপারে নিয়ে যান। এরপর ডাক্তার- বাড়িতে গেলে ডাক্তারের তাৎক্ষণিক ব্যবস্থায় তাঁর মা সুস্থ হয়ে ওঠেন।

ক.	তারাপীঠ কোথায় অবস্থিত?	১
খ.	বামাচরণ কীভাবে বামাক্ষেপা নামে পরিচিত হয়ে ওঠেন? ব্যাখ্যা কর।	২
গ.	সন্তোষবাবুর কর্মের মধ্যে বামাক্ষেপার কোন ঘটনার মিল পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা কর।	৩
ঘ.	'সন্তোষবাবুর মাতৃভক্তি যেন বামাক্ষেপার মাতৃভক্তির প্রতিচ্ছবি'– তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও।	৪

অষ্টম অধ্যায়

হিন্দুধর্ম ও নৈতিক মূল্যবোধ

আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়সমূহে হিন্দুধর্মের স্বরূপ ও বিশ্বাস, স্রষ্টা ও সৃষ্টিসহ কিছু ধর্মীয় কৃত্য এবং হিন্দুধর্মাদর্শের মূর্ত প্রতীক অবতার, মহাপুরুষ ও মহীয়সী নারীদের জীবনচরিত সম্পর্কে জেনেছি। আরও জেনেছি হিন্দুধর্ম সম্পর্কে জ্ঞানলাভের উৎস হিসেবে কিছু ধর্মগুরুর পরিচয়। ধর্মগ্রন্থে তত্ত্বভিত্তিক আলোচনার পাশাপাশি নৈতিক শিক্ষার দৃষ্টান্ত হিসেবে উপাখ্যান থাকে। সেসকল উপাখ্যানের মধ্য দিয়ে যেভাবে নৈতিক শিক্ষা প্রদান করা হয়েছে তার পরিচয়ও আমরা পেয়েছি।

এ- অধ্যায়ে আমরা হিন্দুধর্মের সঙ্গে নৈতিক মূল্যবোধের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করছি।

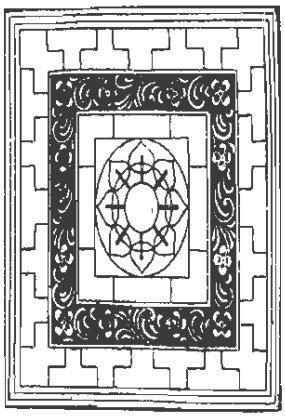
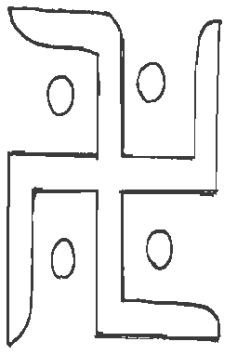
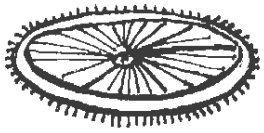

এ অধ্যায়- শেষে আমরা–

- ধর্ম ও নৈতিকতার ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব
- নৈতিক মূল্যবোধ গঠনে হিন্দুধর্মের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব
- হিন্দুধর্মের কতিপয় মূল্যবোধ (জীবসেবা, দয়া, ভক্তি-শ্রদ্ধা কর্তব্যনিষ্ঠা ও ভ্রাতৃপ্রেম) ব্যাখ্যা করতে পারব
- পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে জীবসেবার অভ্যাস, জীবসেবা, দয়া, ভক্তি-শ্রদ্ধা, কর্তব্যনিষ্ঠা, ভ্রাতৃপ্রেম প্রভৃতি নৈতিক মূল্যবোধ গঠনের উপায় ব্যাখ্যা করতে পারব
- ধূমপান অনৈতিক কাজ– একথা ব্যাখ্যা করতে পারব
- সামাজিক জীবনে নৈতিক আচরণে উদ্বুদ্ধ হব।

পাঠ ১ : ধর্ম ও নৈতিকতার ধারণা

ধর্ম

আমরা জানি যা ধারণ করে, তাকে ধর্ম বলে। মানুষ, পশুপাখি, গাছপালা, সমুদ্র-নদী, পাহাড়-পর্বত-মরুভূমি– সবকিছুকে ধর্ম ধারণ করে আছে। আবার ধর্ম শব্দটির একটি অর্থ ন্যায়বিচার ও জীবনাচরণের বিধিবিধান। আমাদের ধর্ম মেনে চলতে হবে– একথার অর্থ হলো আমাকে জীবনাচরণের ক্ষেত্রে বিধিবিধান মেনে চলতে হবে। ন্যায়বিচার করতে হবে। অন্যদিকে ধর্ম হলো কোনো জীব বা বস্তুর গুণ বা বিশেষ বৈশিষ্ট্য। যেমন– আগুনের ধর্ম দহন করা। মানুষেরও নিজস্ব ধর্ম রয়েছে। তার নাম মনুষ্যত্ব বা মানবতা। এ ছাড়া যা থেকে মোক্ষলাভ হয়, তার নামও ধর্ম।

সুতরাং বলা যায়– যে বিশেষ গুণ, যা আমাদের ধারণ করে, যার অনুশীলন দ্বারা জীবের কল্যাণ হয় এবং নিজের মোক্ষলাভ হয়, তার নাম ধর্ম।

'মনুসংহিতা' নামক গ্রন্থে বলা হয়েছে– মানুষের ধর্মের বা মনুষ্যত্বের পাঁচটি বিশেষ লক্ষণ রয়েছে। যেমন– অহিংসা, চুরি না করা, সংযমী হওয়া, দেহ ও মনে শুচি বা পবিত্র পরিচ্ছন্ন থাকা এবং সৎপথে থাকা।

একক কাজ : * ধর্ম শব্দটির বিভিন্ন অর্থের একটি তালিকা প্রস্তুত কর।
* ধর্মের পাঁচটি লক্ষণের নাম লেখ।

নৈতিকতা

যে-কাজ করলে নিজের মঙ্গল হয়, কিন্তু অন্যের কোনো ক্ষতি হয় না, সে- কাজ হচ্ছে ভালো কাজ। যেমন, আমি যোগাসন করি। এতে আমার শরীর ও মনের উপকার হয়। আমার মঙ্গল হয়, কিন্তু অন্য কারো ক্ষতি হয় না। এটা ভালো কাজ।

আবার আমি অন্যের সঙ্গে সম্প্রীতির সম্পর্ক স্থাপন করলাম। সম্প্রীতির ভাব বজায় রেখে সমাজে চললাম। তা হলে কী হবে? তাহলে আমার এবং আমার পাশাপাশি সমাজের সকল মানুষের মঙ্গল হবে। এটা ভালো কাজ।

অন্যদিকে মিথ্যা কথা বললে চরিত্র নষ্ট হয়, পাপ হয়। এতে অন্যের অমঙ্গল হয়। সুতরাং মিথ্যা কথা বলা মন্দ কাজ এবং মহাপাপ। আমরা এটা করব না।

কোনটা ভালো কাজ আর কোনটা মন্দ কাজ তা বিচার করার জ্ঞানকে বলে 'নীতি'। আর 'নৈতিকতা' বলতে বোঝায় ভালো কাজ ও মন্দ কাজের পার্থক্য বুঝে ভালো কাজ করার এবং মন্দ কাজ না করার মানসিকতা। নৈতিকতা একটি চারিত্রিক গুণ। নৈতিকতা একটি মূল্যবোধ।

ধর্ম ও নৈতিকতার সম্পর্ক

ধর্মের সঙ্গে নৈতিকতার গভীর সম্পর্ক রয়েছে। ধর্মের মাধ্যমে অর্জিত হয় নৈতিক শিক্ষা। আবার নৈতিক শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ হয়ে নৈতিক মূল্যবোধ অনুসারে জীবনযাপন করার মধ্য দিয়ে ধর্মীয় উপদেশ ও অনুশাসন পালন করা হয়।

যেমন–

ধর্মীয় উপদেশ : জীবের সেবা কর।

নৈতিকতাও বলে : জীবের সেবা কর।

ধর্মীয় অনুশাসন : সদা সত্য কথা বলবে। সৎ পথে চলবে।

নৈতিকতাও বলে : সদা সত্য কথা বলবে। সৎ পথে চলবে।

নৈতিকতা ধার্মিকের গুণ। যার নৈতিকতা নেই, সে অধার্মিক। ধর্মপথে চললে এ- নৈতিকতা অর্জন করা যায়।

তাই ধর্মের সঙ্গে নৈতিকতার গভীর সম্পর্ক রয়েছে। ধর্মের মধ্য দিয়ে আমরা অর্জন করতে পারি নৈতিক শিক্ষা। আর সে- শিক্ষাকে ব্যক্তিজীবনে ও সমাজজীবনে প্রয়োগ করে একই সাথে পেতে পারি নিজের ও সমাজের সকল মানুষের মঙ্গল।

দলীয় কাজ : শিক্ষক শিক্ষার্থীদের দুটি দলে ভাগ করে দেবেন। একটি দল একটি নৈতিক গুণের কথা বলবে।

অন্যদল আরেকটি বলবে। এরকম পাঁচবার চলবে। প্রতিবারের জন্য ১ পয়েন্ট। যারা বেশি পয়েন্ট পাবে, তারা বিজয়ী হবে।

নতুন শব্দ : দহন, সম্প্রীতি, উদ্বুদ্ধ, মূল্যবোধ, অনুশাসন, নৈতিকতা।

পাঠ ২ : নৈতিক মূল্যবোধ গঠনে হিন্দুধর্মের গুরুত্ব

নৈতিক মূল্যবোধ গঠনে ধর্মের অত্যন্ত গুরুত্ব রয়েছে। ধর্ম সত্য ও ন্যায়ের কথা বলে। মানুষের মঙ্গলের কথা বলে। নৈতিক মূল্যবোধও সেই একই কথা বলে।

হিন্দুধর্মের শিক্ষায়, উপদেশে ও অনুশাসনে নৈতিক মূল্যবোধের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

হিন্দুধর্মে বলা হয়েছে, ঈশ্বর আত্মারূপে জীবের মধ্যে অবস্থান করেন। তাই জীবের সেবা করলে ঈশ্বরের সেবা করা হয়। জীবকে কষ্ট দিলে ঈশ্বরকে কষ্ট দেওয়া হয়। এ- জীবসেবা হিন্দুধর্মের অঙ্গ। হিন্দুধর্মের শিক্ষা। আবার জীবসেবা একটি নৈতিক গুণ। একটি নৈতিক মূল্যবোধ।

অহিংসা, চুরি না করা, সংযমী হওয়া, শুচিতা বা দেহ-মনের পবিত্রতা এবং সৎপথে থাকা– ধর্মের এ পাঁচটি লক্ষণের মধ্য দিয়ে সুস্পষ্ট ভাবেই নৈতিক মূল্যবোধের প্রকাশ ঘটেছে।

হিন্দুধর্মতত্ত্ব নৈতিক মূল্যবোধ অর্জনের সহায়ক। রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থে প্রদত্ত ধর্মীয় উপাখ্যানসমূহ নৈতিক মূল্যবোধ জাগ্রত করার উদাহরণরূপে ব্যবহৃত হয়েছে।

হিন্দুধর্মের উপদেশ-অনুশাসন মেনে চললে এবং ধর্মীয় উপাখ্যানসমূহের দৃষ্টান্ত থেকে শিক্ষা নিয়ে জীবনে প্রয়োগ করলে জীবন হবে ধর্মীয় চেতনায় দীপ্ত এবং নৈতিক শিক্ষায় উজ্জ্বল। আর সে- উজ্জ্বলতায় সমাজ হবে উদ্ভাসিত।

হিন্দুধর্মের নানা প্রতীকে, পূজার উপকরণেও রয়েছে নৈতিকতার প্রতীকী প্রকাশ। দুর্গাপূজার সময় সর্বতোভদ্রমণ্ডল অঙ্কনে, হলুদ, আবির, বেলপাতাগুঁড়ো প্রভৃতি রং ব্যবহার করে সৌন্দর্য সৃষ্টি করা হয়। এর মধ্য দিয়ে প্রকাশ ঘটে শিল্পচেতনার। 'স্বস্তিকা' চিহ্ন শান্তির প্রতীক। 'চক্র' ন্যায়বিচারের প্রতীক। অন্যায়কে ধ্বংস করে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা করতে হলে সাহসের প্রয়োজন। চক্র সাহসের চিহ্ন। শঙ্খ মঙ্গলের প্রতীক। একসঙ্গে শঙ্খধ্বনির মধ্য দিয়ে আহ্বান জানানো হয় : তোমরা এসো, এক হও, এক হয়ে মাঙ্গলিক কাজে অংশ নাও।

আমরা এখন হিন্দুধর্মতত্ত্বের আলোকে জীবসেবা, দয়া, ভক্তি-শ্রদ্ধা, কর্তব্যনিষ্ঠা ও ভ্রাতৃপ্রেম– এ কয়টি নৈতিক মূল্যবোধ সম্পর্কে আলোচনা করব।

নতুন শব্দ : শুচিতা, প্রদত্ত, জাগ্রত, দীপ্ত, উদ্ভাসিত

পাঠ ৩ : জীবসেবা

আমরা কিছু কাজ করি, নিজের মঙ্গলের জন্যে বা নিজের আনন্দের জন্যে। আবার আমরা এমন কিছু কাজ করি যাতে অন্যের মঙ্গল হয়, অন্যের আনন্দ হয়। অন্যের মঙ্গল বা অন্যের আনন্দের জন্য যে- কাজ করা হয় তার নাম 'সেবা'।

সেবা নানাভাবে করা যায়। কেউ অসুস্থ হয়ে পড়ল, আমরা তাঁর শুশ্রূষা করলাম। একে বলতে পারি রোগীর সেবা। বাড়িতে অতিথি আসলেন, তার যত্ন করলাম। একে বলা হয় অতিথিসেবা। সেবার একটি অর্থ উপাসনা করা, তাকে বলে ঠাকুরসেবা।

বাড়িতে গুরুজন কেউ এলে মা বলেন 'সেবা দে'। এখানে সেবা মানে প্রণাম করা, শ্রদ্ধা জানানো। কেউ না খেয়ে আছে, তাকে খেতে দেওয়াকেও বলা হয় সেবা। আমরা যে আহার গ্রহণ করি, তাকেও বলা হয় সেবা। জীবের মঙ্গলের জন্য আমরা যে- কাজ করি, তার নাম জীবসেবা। সমাজের মঙ্গল হয় এমন কাজকে বলা হয় সমাজসেবা।

আবার হিন্দুধর্মতত্ত্বে এ সেবা কথাটি খুবই গভীর অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। হিন্দুধর্মের একটি বিশ্বাস এই যে ঈশ্বর আত্মারূপে জীবের মধ্যে অবস্থান করেন। তাই আমরা যে- খাদ্য গ্রহণ করি, তার দ্বারা আমাদের ভেতর আত্মারূপে যে ঈশ্বর বাস করেন, তাঁর সেবা করি। তাই জীবসেবার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের সেবা করা হয়ে যায়। জীবসেবা যেমন ধর্মের দিক থেকে আচরণীয়, তেমনি নৈতিকতার দিক থেকেও পালনীয় গুণ।

আমরা ধর্মীয় উপখ্যান থেকে জেনেছি, পুরাকালে রন্তিদেব অযাচক ব্রত পালনের সময় আটচল্লিশ দিন অভুক্ত থাকার পর খাদ্য পেয়েছিলেন। কিন্তু নিজে অভুক্ত থেকে ক্ষুধার্তদের সেবা করেছিলেন।

কেবল এ- উপখ্যানই নয়, হিন্দুধর্মগ্রন্থে জীবসেবার এমন অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে।

নতুন শব্দ : শুশ্রূষা, উপাসনা, আচরণীয়, অযাচক ব্রত।

পাঠ ৪ : দয়া

কারো কষ্ট দেখলে মন কাঁদে। তার কষ্ট দূর করে দিতে ইচ্ছা হয়। মনের এ- ভাবকে বলা হয় দয়া।

দয়া একটি নৈতিক গুণ। সমাজের জন্য একটি প্রয়োজনীয় প্রবৃত্তি হচ্ছে দয়া। দয়া করা হয় কাকে? যে ক্ষুধায় কষ্ট পাচ্ছে, তাকে খাদ্য দিয়ে আমরা দয়া করি।

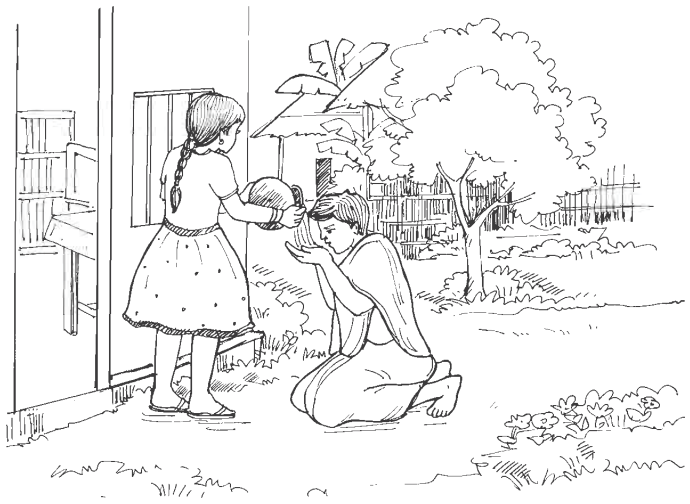

আমরা জানি, জীবের মধ্যে আত্মারূপে ঈশ্বর অবস্থান করেন। তাই জীবকে দয়া করলে, জীবের দুঃখ দূর করলে, ঈশ্বর সন্তুষ্ট হন। ঈশ্বর নিজেই দরিদ্ররূপে ঘুরে বেড়ান দয়া পাবেন বলে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায় :

'জগতে দরিদ্ররূপে ফিরি দয়া তরে,
গৃহহীনে গৃহ দিলে আমি থাকি ঘরে।'

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু দয়াকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করেছেন। ভগবানের নামে রুচি, জীবের প্রতি দয়া এবং বৈষ্ণবরূপ মানুষের সেবা করাকে তিনি সনাতন ধর্ম অর্থাৎ হিন্দুধর্মের প্রধান বৈশিষ্ট্য বলে উল্লেখ করেছেন। এ- বিষয়ে তাঁর শিক্ষা হচ্ছে :

'নামে রুচি জীবে দয়া বৈষ্ণব সেবন।
ইহা হৈতে ধর্ম আর নাহি সনাতন॥'

মোটকথা, দয়ার প্রবৃত্তির দ্বারা আমাদের মন কোমল ও সহানুভূতিশীল হয়। দয়ার দ্বারা সমাজের মঙ্গল হয়। শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীচৈতন্য, রাজা হরিশ্চন্দ্র, মহাবীর কর্ণ প্রমুখ দয়ার বহু দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। আমরাও আমাদের জীবনে ও সমাজে দয়ার আদর্শের প্রতিফলন ঘটাব।

একক কাজ : নিজের বা অন্যের জীবন থেকে জীবসেবা ও দয়ার দুটি করে ঘটনা উল্লেখ কর।

নতুন শব্দ : প্রবৃত্তি, রুচি, সহানুভূতিশীল, প্রতিফলন।

পাঠ ৫ : ভক্তি-শ্রদ্ধা

ভক্তি বা শ্রদ্ধা একটি নৈতিক গুণ এবং তা ধর্মেরও অঙ্গ।

আমরা মা-বাবাকে শ্রদ্ধা করি। শিক্ষকদের শ্রদ্ধা করি। যারা আমাদের গুরুজন তাঁদের আমরা শ্রদ্ধা করি। আর গুরুজনেরা আমাদের স্নেহ করেন।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, বড়দের প্রতি ছোটদের যে-শিষ্টাচার তাকে বলে শ্রদ্ধা। ছোটদের প্রতি বড়দের যে-মমতামাখা আচরণ, তার নাম স্নেহ।

শ্রদ্ধা ও ভক্তি সমার্থক। তবে ব্যবহারের ক্ষেত্রে একটু পার্থক্য আছে। ভক্তি হচ্ছে ভক্তির পাত্রের প্রতি চরম অনুরাগ । শ্রদ্ধা যখন গভীর হয়, তখন তাকে বলে ভক্তি।

আমরা ঈশ্বরকে ভক্তি করি। কারণ তিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন। তিনি আমাদের পালন করেন। তিনি নানাভাবে আমাদের মঙ্গল করেন। ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি দুভাবে প্রকাশ করা যায়।

এক. সরাসরি ঈশ্বরের নাম জপ, নামকীর্তন ইত্যাদি মাধ্যমে।

দুই. আমাদের মা-বাবা-শিক্ষকসহ গুরুজনদের ভক্তি করার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের প্রতি ভক্তির প্রকাশ ঘটে।

আমরা দেব-দেবীদের বিশেষ গুণ ও শক্তি অর্জনের জন্যে তাঁদের ভক্তি করি। পূজার মধ্য দিয়ে দেবতাদের প্রতি আমাদের ভক্তি প্রকাশ পায়।

আমরা জানি, ঈশ্বর যখন ভক্তকে কৃপা করেন, তখন তাঁকে ভগবান বলে। ভক্ত যেমন ভগবানকে ভক্তি করেন, তেমনি ভগবানও ভক্তকে দেখে রাখেন। তাই তো বলা হয়, 'ভক্তের ভগবান' কিংবা 'ভক্তের বোঝা ভগবান বহন করেন।'

ভক্ত সুখ ও দুঃখকে একইভাবে গ্রহণ করেন। কর্মের ফলের দিকে না তাকিয়ে কেবল কর্তব্যকর্ম করে যান। তিনি সহিষ্ণু, পরদুঃখকাতর। পরের সুখে সুখী হন, দুঃখে দুঃখী হন। কেউ তাঁর পর নয়। সকল মানুষকে তিনি আপন ভাবেন।

তিনি নিজে ও তাঁর সকল কাজ ঈশ্বরে সমর্পণ করেন। অর্থাৎ তাঁর সকল কাজ ঈশ্বরের কাজ। তিনি শুধু কাজটি সম্পাদন করছেন।

ভক্তের এই ফলের আশা না করে কর্তব্য পালন করে যাওয়া, সুখ ও দুঃখকে সমানভাবে গ্রহণ করা, পরোপকার, সহিষ্ণুতা, অহিংসা প্রভৃতি নৈতিক গুণগুলো যে- মূল্যবোধ সৃষ্টি করে, তা ব্যক্তি ও সমাজের জন্য খুবই প্রয়োজনীয়।

ভক্তিতে ব্যক্তির মুক্তি আর সমাজেরও মঙ্গল।

ধর্মীয় উপাখ্যানে প্রহ্লাদ, ধ্রুব, অর্জুন, রাজা রন্তিদেব প্রমুখের ভক্তির কাহিনী উজ্জ্বল হয়ে আছে।

আবার দীন দরিদ্র ব্রাহ্মণ থেকে শুরু করে শবর শ্রেণির এক কন্যা শবরীর ভক্তির উপাখ্যান দেদীপ্যমান হয়ে রয়েছে।

নতুন শব্দ : শিষ্টাচার, সমার্থক, অনুরাগ, জপ, সহিষ্ণু, পরদুঃখকাতরতা, সমর্পণ, দেদীপ্যমান

পাঠ ৬ : কর্তব্যনিষ্ঠা

আমরা আমাদের পরিবারে ও সমাজে নানারকমের কাজ করি। আমাদের মধ্যে যারা শিক্ষার্থী, তাদের কাজ কী? এর উত্তর হবে : ভালো করে লেখাপড়া করা এবং জ্ঞান অর্জ ন করা। যাঁরা চাকরি করেন, তাঁদের নিজেদের কাজ যত্নের সঙ্গে করতে হয়।

সমাজেও মানুষকে নির্দিষ্ট কর্তব্য পালন করতে হয়। সে-কর্তব্য পালনে কেউ অবহেলা করলে গোটা সমাজেরই ক্ষতি হয়।

আমরা নিশ্চয়ই লেভেলক্রসিং দেখেছি। রেল লাইন আর সড়ক যেখানে একে অন্যকে ভেদ করে চলে গেছে, সেই জায়গাটাকে বলে লেভেলক্রসিং।

ট্রেন আসার আগেই ঠিক সময় রেললাইন ভেদ করে যাওয়া সড়কটি দুপাশ থেকে প্রতিবন্ধক দণ্ড ফেলে বন্ধ করে দিতে হয়। এজন্যে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মচারী আছেন। তিনি ট্রেন আসার ঠিক আগে প্রতিবন্ধক ফেলে সড়কপথ বন্ধ করলেন না। তা হলে কী হবে? সড়ক দিয়ে গাড়ি চলতে থাকবে, লোকজন চলতে থাকবে। ট্রেনও এসে পড়বে। তাতে ঘটবে দুর্ঘটনা। তাই লেভেলক্রসিং-এ প্রতিবন্ধকতা ফেলার এবং ওঠানোর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মচারীর কর্তব্যনিষ্ঠার ওপর যানবাহন ও জনগণের চলাচলের নিরাপত্তা নির্ভর করে।

একথা জীবন ও সমাজের সকল ক্ষেত্রেই খাটে। সুতরাং আমরা কর্তব্যনিষ্ঠার আদর্শ অনুসরণ করে চলব। এর দ্বারা আমাদের প্রত্যেকের ব্যক্তিজীবন সুন্দর হবে এবং সমাজে থাকবে শৃঙ্খলা ও শান্তি। জীবন ও সমাজ হবে আনন্দময়।

আরুণির কর্তব্যনিষ্ঠার উপাখ্যানটি আমরা পড়েছি। সেই যে ধৌম্যের শিষ্য আরুণি। তিনি গুরুর আদেশে ক্ষেতের আল বেঁধে বর্ষার জল আটকাতে গিয়েছিলেন। কিন্তু জল আটকানোর জন্য আল বাঁধতে না পেরে নিজেই আল হয়ে ক্ষেতের পাশে শুয়েছিলেন।

আরুণির এ-কর্তব্যনিষ্ঠার উপাখ্যান ধর্মগ্রন্থে স্বর্ণাক্ষরে লেখা রয়েছে। আর আমাদের যেন ডেকে বলছে, 'তোমরাও আরুণির মতো কর্তব্যনিষ্ঠ হও।'

নতুন শব্দ : লেভেলক্রসিং, প্রতিবন্ধক, আল।

পাঠ ৭ : ভ্রাতৃপ্রেম

কাজল আর সজল। দুই ভাই। দুজনে খুব মিল। কাজলের খুশিতে সজল খুশি হয়। সজলের খুশিতে কাজল খুশি হয়। আবার কাজল কষ্ট পেলে সজল কষ্ট পায়। সজল কষ্ট পেলে কাজল কষ্ট পায়। এই যে কাজল ও সজলের একের প্রতি অন্যের ভালোবাসা বা মমতা, একেই বলে ভ্রাতৃপ্রেম।

আমাদের পরিবারে ও সমাজে ভ্রাতৃপ্রেম খুবই দরকারি একটি নৈতিক গুণ। যেসকল নৈতিক গুণের জন্যে পরিবার শান্তিপূর্ণ ও আনন্দময় থাকে, সেগুলোর মধ্যে ভ্রাতৃপ্রেম একটি। আর প্রতিটি পরিবার শান্তিপূর্ণ থাকলে গোটা সমাজও শান্তিপূর্ণ থাকবে।

আমরা জানি, রামায়ণে রাম-সীতা যখন চোদ্দ বছরের জন্য বনে যান, তখন লক্ষ্মণও রামের সঙ্গে বনে যান। ভ্রাতৃপ্রেমের কী অপূর্ব দৃষ্টান্ত! একইভাবে ভরত রাজ্য শাসনের ভার পেয়েও রামকে ফিরিয়ে আনতে যান। রাম ফিরলেন না। ভরত তাঁর পাদুকা সিংহাসনে রেখে নিচে বসে রাজ্য শাসন করতে লাগলেন। আমরা জানি, রাম ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যভার ফিরিয়ে দিলেন। তাই ভরতের ভ্রাতৃপ্রেম উজ্জ্বল হয়ে আছে।

লক্ষ্মণ আর ভরতের এ-ভ্রাতৃপ্রেম রামায়ণে উজ্জ্বল হয়ে আছে। তাঁদের এ ভ্রাতৃপ্রেমের দৃষ্টান্ত আমরাও অনুসরণ করব। তাহলে আমাদের পরিবার ও সমাজ শান্তিপূর্ণ ও আনন্দময় হবে।

পাঠ ৮ : ধূমপান অনৈতিক কাজ

আমরা এতক্ষণ কিছু নৈতিক মূল্যবোধ সম্পর্কে আলোচনা করেছি। এখন একটি অনৈতিক কাজ সম্পর্কে আলোচনা করছি। এসো, আমরা ভালোর পাশাপাশি মন্দকেও চিনে রাখি। আলোর বিপরীতে যেমন থাকে অন্ধকার, তেমনি নৈতিকতার বিপরীতে লুকিয়ে থাকে অনৈতিক কাজের হাতছানি।

ধূমপানের কথাই ধরা যাক।

আমাদের চারপাশে এত লোক ধূমপান করে যে, আমাদের মনেই হয় না যে, কাজটি খুবই অনৈতিক। ধূমপানের কথায় উঠে আসে মাদকাসক্তি প্রসঙ্গ। মাদক বলতে এমন কিছু জিনিসকে বোঝায় যা আমাদের নেশাগ্রস্ত করে। আমাদের দেহ ও মনের ওপর ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করে। আমাদের শারীরিক ও মানসিক দিক থেকে অসুস্থ করে তোলে। এমনকি মাদকসেবী মারা পর্যন্ত যায়।

ধূমপানও এক ধরনের মাদকাসক্তি।

ধূমপান বলতে বোঝায় বিড়ি, সিগারেট, চুরুট, তামাক ইত্যাদিতে বিশেষভাবে আগুন ধরিয়ে সেগুলোর ধূম বা ধোঁয়া পান করা।

ধূমপানকে বিজ্ঞানী ও চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা বিষপান বলে অভিহিত করেছেন। কারণ বিড়ি সিগারেট তামাক বা চুরুটের ধোঁয়ায় থাকে 'নিকোটিন' জাতীয় পদার্থ। এ-পদার্থ বিষ। এ-বিষ মানুষের শরীরে প্রবেশ করে মানুষের অসুস্থতা এবং মৃত্যুর কারণ হয়। ধূমপানের মধ্য দিয়ে নিকোটিন জাতীয় বিষ শরীরে প্রবেশ করে। তাতে শরীর ও মনের খুবই ক্ষতি হয়।

চিকিৎসকগণ বলেন, ধূমপানের ফলে শ্বাসকষ্ট, নিউমোনিয়া, ব্রংকাইটিস, যক্ষ্মা, ফুসফুসের ক্যানসার, গ্যাসট্রিক-আলসার, ক্ষুধামান্দ্য, হৃদরোগ ও মানসিক অবসাদসহ অনেক ধরনের রোগ হয়।

এসব রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির অকালমৃত্যুও ঘটে। অন্যদিকে ধূমপায়ী ব্যক্তি শুধু নিজেরই ক্ষতি করে না, অন্যদেরও নানাভাবে ক্ষতি করে। ধূমপানের সময় তার চারপাশের শিশু, নারী-পুরুষ, বৃদ্ধ-যুবক সকলেই ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। একে পরোক্ষ ধূমপান বলা হয়, যা অধূমপায়ীদের জন্য সাংঘাতিক ক্ষতিকর।

ধূমপান একটি বদভ্যাস। একটি দুর্বার ও ক্ষতিকর নেশা।

হিন্দুধর্মে সকল প্রকার নেশাকেই শুধু নয়, নেশাগ্রস্তের সঙ্গে সম্পর্ক রাখাকেও মহাপাপ বলা হয়েছে।

তা ছাড়া এ-দেহ ঈশ্বরের অধিষ্ঠান। একে পবিত্র রাখব। এমন কিছু করব না যাতে নিজের কিংবা অন্যের শরীর ও মনের ক্ষতি হয়।

এসো, আমরা প্রতিজ্ঞা করি :

'রাখব উঁচু নিজের মান,
করব নাকো ধূমপান।
মনে রাখি কথাখান,
ধূমপানে বিষ পান।
ধূমপানকে না বলব,
নীতিধর্ম মেনে চলব।'

নতুন শব্দ : চুরুট, নিকোটিন, নিউমোনিয়া, ব্রংকাইটিস, সংস্পর্শ, দুর্বার।

পাঠ ৯ : পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে নৈতিক মূল্যবোধ গঠনের উপায়

'শৃঙ্খলাবোধ' নৈতিক মূল্যবোধ গঠনের অন্যতম উপায়। ঈশ্বর জীব ও জগৎ সৃষ্টি করেছেন। ঈশ্বরের সৃষ্টির মধ্যে একটা শৃঙ্খলা রয়েছে। তেমনি আমরাও আমাদের জীবনে আনব শৃঙ্খলাবোধ। ঈশ্বরের শৃঙ্খলাবোধের প্রকাশ ঘটেছে তাঁর সৃষ্টিকর্মে। আমরাও আমাদের নিজেদের জীবনে ও আচরণে শৃঙ্খলাবোধের প্রকাশ ঘটাব।

পারিবারিক জীবনে একটি পরিবারের সদস্যগণ পরস্পরের সঙ্গে নানাভাবে জড়িত। তাই নিজের অধিকার ভোগ করার সঙ্গে পরিবারের অন্যান্য সদস্যের প্রতি আমাদের কর্তব্য রয়েছে। এ-সত্য আমরা যেন ভুলে না যাই।

সমাজের ক্ষেত্রেও সমাজের সকল সদস্যের এককভাবে এবং সম্মিলিতভাবে দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে হয়। আর তা করতে গিয়েই তো কতগুলো নৈতিক মুল্যবোধের উদ্ভব ঘটেছে। যেমন– সততা, সহিষ্ণুতা, সম্প্রীতি, সেবা, সৌহার্দ্য, একতা, সত্যবাদিতা, জীবসেবা, দয়া, কর্তব্যনিষ্ঠা প্রভৃতি নৈতিক মূল্যবোধ।

ধর্মও সকল নৈতিক মূল্যবোধকে তার উপদেশ ও অনুশাসনে পরিণত করেছে। হিন্দুধর্মগ্রন্থে ধর্মের যে বিশেষ দশটি লক্ষণের কথা বলা হয়েছে, তার মধ্যে রয়েছে অহিংসা, সত্যবাদিতা, অক্রোধ বা রাগ না করা, ধীশক্তি, বিদ্যা, সংযম ইত্যাদি। যিনি ধার্মিক, তিনি এগুলো পালন করেন। আর এভাবেই নৈতিক মূল্যবোধ পরিণত হয় ধর্মীয় অনুশাসনে। আবার ধর্মীয় অনুশাসন থেকে তৈরি হয় নৈতিক মূল্যবোধ।

নিজের মুক্তি বা মোক্ষলাভ এবং জগতের কল্যাণ– এই হচ্ছে হিন্দুধর্মের একটি মূল কথা।

জীবকে ঈশ্বর জ্ঞান করলে আর কোনো সংকীর্ণতা থাকতে পারে না। কারণ ঈশ্বরকে ভক্তি করা, তার সেবা করা আমাদের ধর্মীয় তথা নৈতিক কর্তব্য। সততা, ভক্তি-শ্রদ্ধা, দয়া-মায়া-স্নেহ প্রভৃতি সূত্রে যদি গোটা পরিবার বাঁধা থাকে, তাহলে পারিবারিক জীবন নৈতিকতায় মণ্ডিত হবেই।

সমাজ জীবনের ক্ষেত্রেও একথা সত্য।

সমাজ ও জীবনকে সত্য, সুন্দর ও শান্তিমণ্ডিত করা নৈতিকতার লক্ষ্য। ধর্মও তাই। সুতরাং ধর্মীয় অনুশাসন ও নৈতিকতা অনুসরণ এবং অনুশীলন করে আমরা পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে নৈতিক মূল্যবোধ গঠন করতে পারি।

নতুন শব্দ : ধীশক্তি, সৌহার্দ্য, সংকীর্ণতা, মণ্ডিত।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ কর :

১. মানুষের নিজস্ব ধর্ম .....।

২. পরের কষ্ট দূর করার প্রবৃত্তির নাম .....।

৩. নীতি হচ্ছে ভালো কাজ ও মন্দ কাজ ..... করার জ্ঞান।

৪. রাজা রন্তিদেব ..... ব্রত পালন করেছিলেন।

৫. শৃঙ্খলাবোধ হচ্ছে ..... গঠনের অন্যতম উপায়।

ডানপাশ থেকে শব্দ বা বাক্যাংশ এনে বাম পাশের সাথে মিল কর :

বামপাশ	ডানপাশ
১. ধর্মের সঙ্গে নৈতিক মূল্যবোধের	বৈষ্ণব সেবন
২. জীবের মধ্যে আত্মারূপে	মন কোমল ও সহানুভূতিশীল হয়
৩. নামে রুচি জীবে দয়া	ঈশ্বর সন্তুষ্ট হন
৪. দয়ার প্রবৃত্তির দ্বারা আমাদের	গভীর সম্পর্ক রয়েছে
	ঈশ্বর আছেন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

১. মানুষের ধর্মের বা মনুষ্যত্বের কয়টি বিশেষ লক্ষণ রয়েছে?

ক. ২ খ. ৩
গ. ৫ ঘ. ১০

২. শ্রদ্ধা যখন গভীর হয় তখন তাকে কী বলে?

ক. স্নেহ খ. দয়া
গ. ভক্তি ঘ. শিষ্টাচার

৩. নৈতিকতা বলতে বোঝায়–

i. ভালো কাজ করার মানসিকতা
ii. ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলা
iii. অন্যের অমঙ্গল না করা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. ii ও iii
গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেটি পড় এবং ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রী কণার বাড়ির পাশে একটি বিড়াল ছানা অসহায়ভাবে পড়ে আছে দেখে তার মায়া হয়। সে এটিকে বাড়িতে নিয়ে আসে এবং আদরযত্নে বড় করে তোলে। বিড়ালটি এখন কণার খুবই ভক্ত।

৪. কণার আচরণে কোন নৈতিক মূল্যবোধের প্রকাশ ঘটেছে?

ক. ভক্তি খ. শ্রদ্ধা
গ. জীবসেবা ঘ. কর্তব্যনিষ্ঠা

৫. কণার উক্ত আচরণের অন্তর্নিহিত সারকথা হলো–

ক. ভক্তিই মুক্তির পথ খ. শ্রদ্ধাই মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ মূল্যবোধ
গ. জীবসেবাই ঈশ্বরের সেবা ঘ. কর্তব্যনিষ্ঠা মানুষকে মহান করে তোলে

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১. ধর্ম বলতে কী বোঝ?
২. ধর্মের বিশেষ লক্ষণগুলো কী?
৩. কর্তব্যনিষ্ঠা উদাহরণসহ লেখ।
৪. ভক্তি শব্দটির প্রয়োগ উদাহরণসহ লেখ।

বর্ণনামূলক প্রশ্ন :

১. ধর্ম ও নৈতিকতার সম্পর্ক উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর।
২. হিন্দুধর্ম অধ্যয়নের মধ্যেই নিহিত রয়েছে নৈতিক মূল্যবোধ গঠনের মূলকথা– ব্যাখ্যা কর।
৩. সদাচরণের মূলেই রয়েছে ভক্তি-শ্রদ্ধা– কথাটি বুঝিয়ে লেখ।
৪. জীবসেবা একটি নৈতিক গুণ– দৃষ্টান্তসহ ব্যাখ্যা কর।
৫. ভ্রাতৃপ্রেম দৃষ্টান্তের মাধ্যমে ব্যাখ্যা কর।

সৃজনশীল প্রশ্ন :

১। প্রণববাবু শিক্ষকতা করেন। তার স্ত্রী ব্যাংকে চাকরি করেন। তাঁদের দুটি ছেলে মেয়ে। প্রণববাবু ছেলেমেয়েদের দেখাশুনার জন্য গ্রামের বাড়ি থেকে রিপনকে নিয়ে আসেন। কিছুদিন পর রিপন অসুস্থ হয়ে পড়লে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর দেখা গেল সে ডায়াবেটিসে আক্রান্ত। এমন রোগের কথা শুনে প্রণববাবুর স্ত্রী রিপনকে বাড়িতে পাঠিয়ে দিতে বলেন। কিন্তু প্রণববাবু তা না করে রিপনের সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করেন এবং পরিবারের সকলকে সহানুভূতিশীল হওয়ার পরামর্শ দেন।

ক. যা আমাদের ধারণ করে তাকে কী বলে? ১
খ. নৈতিকতা ধারণাটি উদাহরণসহ লেখ। ২
গ. প্রণববাবুর আচরণে কোন নৈতিক গুণটি প্রকাশ পেয়েছে তা তোমার পঠিত নৈতিক মূল্যবোধের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. 'প্রণববাবুর পরামর্শটি ছিল যৌক্তিক'– উক্তিটি তোমার পঠিত নৈতিক মূল্যবোধের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

২। শোভন সবসময় লেখাপড়ায় মনোযোগী ছিল। হঠাৎ কিছু দুষ্টু ও খারাপ ছেলেদের সাথে মিশে ধূমপান শুরু করে। এরপর ধীরে ধীরে অন্যান্য মাদকে আসক্ত হয়। এতে তার স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে যায় এবং পড়াশুনায় মনোযোগ দিতে পারে না। এদিকে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মহোদয় তার বাবাকে তার আচরণ ও লেখাপড়ার অবনতির কথা জানালে তিনি চিন্তিত হয়ে পড়েন। অবশেষে তিনি ও প্রধান শিক্ষক মহোদয় শোভনকে এ অবস্থা থেকে ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ নেন। এতে শোভন সুস্থ ও স্বাভাবিক হয়ে ওঠে এবং মাদককে 'ঘৃণা' ও 'না' বলার অঙ্গীকার করে।

ক. ধর্মীয় দৃষ্টিতে ধূমপান কী ধরনের কাজ? ১
খ. ধূমপানকে কেন বিষপান বলা হয়? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. শোভনের কোন ধরনের শারীরিক ক্ষতি হতে পারে– তা ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. শোভনের অঙ্গীকারটি তোমার পঠিত নৈতিক মূল্যবোধ-সম্পর্কিত প্রতিজ্ঞা ছড়ার আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

সমাপ্ত

২০১৩
শিক্ষাবর্ষ
৬–হিন্দুধর্ম

জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বর লাভ
-শ্রী রামকৃষ্ণ

বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন– দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতামুক্ত সোনার বাংলাদেশ গড়তে
নিজেদের যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোল
– মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

২০১০ শিক্ষাবর্ষ থেকে সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে :